চাঁদমামা
ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯
Rs. 1.25

DADDY
MUMMY
AND...
I
আমি আমার একো
স্কেচ পেন দিয়ে
সব আঁকি
EKCO
স্কেচ পেন
রঙবেরঙের, শিশুরা ওগুলি পছন্দ করে।
তারা ছবি আঁকতে ভালবাসে।
আপনার শিশুর মধ্যে সুপ্ত
প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলুন। তাদের
একো স্কেচ পেনের সেট উপহার
দিন। ঐগুলি আকষক
রঙবেরঙের পাওয়া যায়।
EKCO
SKETCH PEN
FOR SKETCHING COLOURING • SIGNING
পরিবেশক: কিরণ অ্যাণ্ড কোম্পানী
৭১/৭৫, শামসেট স্ট্রীট, বম্বে ৪০০ ০০২,
টেলিফোন: ৩২৪৪৩২
একো স্কেচ পেনে লিখে আনন্দ পাওয়া যায়।
ADVERTS/WP/216/B/G8

চাঁদমামা

সংস্থাপক ঃ চক্রপাণি
নিয়ন্ত্রণ ঃ বি. নাগি রেড্ডি

প্রশ্নোত্তর বিভাগের জন্য আমরা সহৃদয় পাঠকপাঠিকাদের আরও বেশি করে প্রশ্ন পাঠাতে অনুরোধ করছি। এই বিভাগ যাতে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হয় তার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের সহযোগিতা একান্তভাবে আমাদের কাম্য।

অমর বাণী

কিম্ তয়া ক্রিয়তে ধেন্বা
যা ন সূতে, ন দুগ্ধদা ?
কোর্থম্ পুত্রেন জাতেন
যো ন বিদ্বান্নভক্তিমান ?

[যে গরু দুধ দেয় না সেই গরুকে দিয়ে কি হবে ? যে ছেলের কোনরূপ বিদ্যা বা বিনয় নেই তাকে দিয়েই বা কি হবে ?]

খণ্ড ৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সংখ্যা ৮
প্রতি সংখ্যা ১.২৫ * বাৎসরিক চাঁদা ১৫.০০

প্রশ্নোত্তর

সুধাকর, আজমীড় (রাজস্থান)

প্রশ্ন ঃ বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে চন্দ্র যে আসলে কি তা জানার পর তার প্রভাব চাঁদমামার উপর কতখানি পড়েছে তা কি জানাতে পারেন ?

উত্তর ঃ বৈজ্ঞানিক চেতনা হওয়ার পর থেকে চন্দ্র যে কি তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও সকলের জানা হয়ে গেছে। তবু পুরাণে চন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে বারে বারে। আমাদের এই চাঁদমামা একটি নাম। শুধু নাম। এর মধ্যে কোন প্রতীক থাকলেও থাকতে পারে। সেটা নিছক প্রতীক। সুধাকর শব্দের অর্থ চন্দ্র কিন্তু আপনি তো জানেন বাস্তবে আপনার সঙ্গে চন্দ্রের সম্পর্ক কতখানি।

সরলকুমারী, কুপ্পম (অন্ধ্র)

প্রশ্ন ঃ চাঁদের চেয়ে নক্ষত্র কতগুণ বড় ? চন্দ্রমণ্ডল ও নক্ষত্রমণ্ডলের দূরত্ব কতখানি ?

উত্তর ঃ মনে হয় যেন কেউ ঠিক করে সাজিয়ে রেখেছেন চাঁদ এবং সূর্যকে। মাঠের উপর দাঁড়িয়ে আমরা সূর্য (নক্ষত্র) এবং চন্দ্রকে একই আয়তনের ছবির মত দেখতে পাই। আসলে চন্দ্রের চেয়ে সূর্য তিনশ গুণ বেশী বড়। জানা গেছে সূর্যের চেয়ে দশহাজার গুণ এমন কি লক্ষ গুণ বড় নক্ষত্রও আকাশে আছে।

চন্দ্র আমাদের কাছ থেকে দুশো চল্লিশ হাজার মাইল দূরে আছে। কারও কারও মতে চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ নয়, পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের উপগ্রহ। সেদিক থেকে দেখলে পৃথিবীকে চন্দ্রমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ধরা যায়। আসলে নক্ষত্রমণ্ডল বলে কোন মণ্ডল নেই। কারণ একটি নক্ষত্র থেকে আর একটি নক্ষত্রের দূরত্ব অনেক বেশী। বহু নক্ষত্রের চেয়ে আমাদের অনেক কাছের নক্ষত্র হল সূর্য। সূর্যের পরেই আমাদের কাছাকাছি আর যে নক্ষত্র আছে সেটা আছে চাব্বিশ লক্ষ কোটি মাইল দূরে। অর্থাৎ সূর্যের চেয়ে সেই নক্ষত্র আছে আটাশ লক্ষ গুন দূরে। সমগ্র আকাশ জুড়েই আছে নক্ষত্রমণ্ডল।

মিত্রলাভ

ছেষট্টি

রাজার প্রশ্নের জবাবে কুমোর বলল, "মহারাজ, আমার নাম যুধিষ্ঠির। এক সাধারণ কুমোর পরিবারে আমার জন্ম। এই চিহ্ন কোন তরবারির আঘাতের চিহ্ন নয়। একবার আমি খুব নেশাভাং করে যেখানে সেখানে গড়াগড়ি খেতে খেতে এই আঘাত পেয়েছি। ঐ চিহ্নই রয়ে গেল।"

রাজা এই কথা শুনে যুধিষ্ঠিরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিল।

তখন কুমোর জোড়হাত করে রাজাকে বলল, "মহারাজ আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে আমার ধৈর্য, বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখুন।"

"তুমি যতবড় বীর এবং ধৈর্যশালী হও না কেন তোমার বংশের রক্ত তোমার মধ্যে থাকবেই। তোমার বংশের কেউ কোনদিন হাতি মারতে পারবে না। এই বিষয়ে আমার একটি কাহিনী শোনা আছে।" রাজা বলল।

"মহারাজ, দয়া করে ঐ কাহিনী শোনাবেন ? যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে রাজা কাহিনী শুরু করল ঃ

সিংহীর পোষা শেয়ালের কাহিনী

কোন এক অরণ্যে একটি পুরুষ
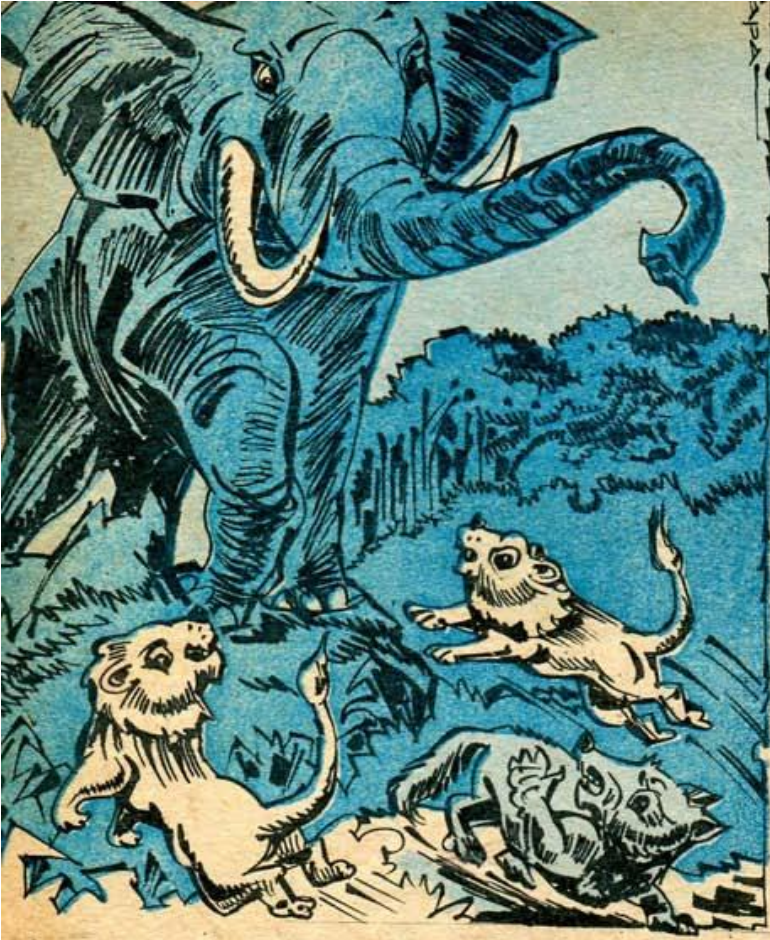
সিংহ ও একটি নারী সিংহ ছিল। সিংহীর দুটো বাচ্চা হয়েছিল। সিংহ প্রত্যেকদিন শিকার করে এনে সিংহীকে খাওয়াত। একদিন অন্ধকার হয়ে গেল কিন্তু সিংহ ফিরল না। সেদিন সারাদিনে সিংহ কিছুই শিকার করতে পারেনি। হতাশ হয়ে ফেরার সময় সে দেখতে পেল একটি শেয়ালের বাচ্চা। বাচ্চাটিকে দেখে তার প্রতি সিংহের দয়া হল। ঐটুকু বাচ্চাকে খেতে ইচ্ছে করল না। সে ঐ বাচ্চাটিকে মুখে ধরে সিংহীর কাছে এল।

শেয়াল ছানাটিকে সিংহী তার তৃতীয় বাচ্চার মত লালন পালন করল। সিংহী শেয়াল ছানাটিকে নিজের বুকের দুধ খাওয়াল।

কিছুদিনের মধ্যেই সিংহীর দুধ খেয়ে শেয়ালের বাচ্চাটা বেশ বড় হয়ে গেল। শেয়ালের বাচ্চা এবং সিংহীর বাচ্চা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে, খেলাধূলো করে বেড়ে ওঠায় নিজেদের পার্থক্যটা ঠিক বুঝতে পারল না। তিনজনে তিন ভাইয়ের মত থাকতে লাগল। একদিন ঐ তিনটি বাচ্চা অরণ্যের গভীরে ঘোরাফেরা করছিল। হঠাৎ তাদের সামনে পড়ে গেল একটি হাতি। হাতিকে দেখেই সিংহের বাচ্চা দুটি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। তখন শেয়ালের বাচ্চা বলল, "অমন কাজ করো না। মনে রেখ, এ জন্তুটা হল তোমাদের জাতশত্রু।" বলেই সে সোজা সিংহী যেখানে ছিল সেখানে ছুটে এল।

শেয়ালছানার চলে যাওয়ার ফলে সিংহশাবক দুটো নিরুৎসাহিত হয়ে হাতিকে ছেড়ে দিল। তাই বলছি,

ধৈর্যশালী কোন যোদ্ধাকে নানা ধরনের কথা বলে উত্তেজিত করতে পারে কিন্তু সে আক্রমণ করতে পারে না!

সিংহশাবক দুটো ফিরে গিয়ে তাদের মা বাবাকে জানাল, কেমনভাবে শেয়ালছানা হাতিকে দেখে ভয়ে কাঁপছিল, তার চোখ লাল হয়ে উঠেছিল, তার ঠোঁট কাঁপছিল এবং সে ভাইদের ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল।

এরপর থেকে শেয়ালছানার সঙ্গে সিংহশাবক দুটোর ঝগড়া লেগেই থাকত। ওদের মধ্যে ঝগড়া যাতে বেশী না লাগে তার জন্য সিংহী শেয়াল-ছানাকে বলত, "বাবা, ভাইদের মত ঝগড়াঝাঁটি ভাল নয়। যতই হোক, বয়সে ওরা তোমার থেকে ছোট। তুমি ওদের বুঝিয়ে বলবে।"

শেয়ালছানা কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, "ছোটভাই বলে মাথায় করে নাচব? ধৈর্যের সঙ্গে একটা ঘটনাকে বোঝার ক্ষমতা ওদের আছে? ওদের কি আছে? না আছে রূপ না আছে গুণ। এরপর রেগে গিয়ে ওদের কোনদিন মেরে ফেলব তখন বুঝবে।"

সিংহী হাসি চেপে শেয়ালছানাকে বলল, "বাবা, তোমার হয়ত অনেক
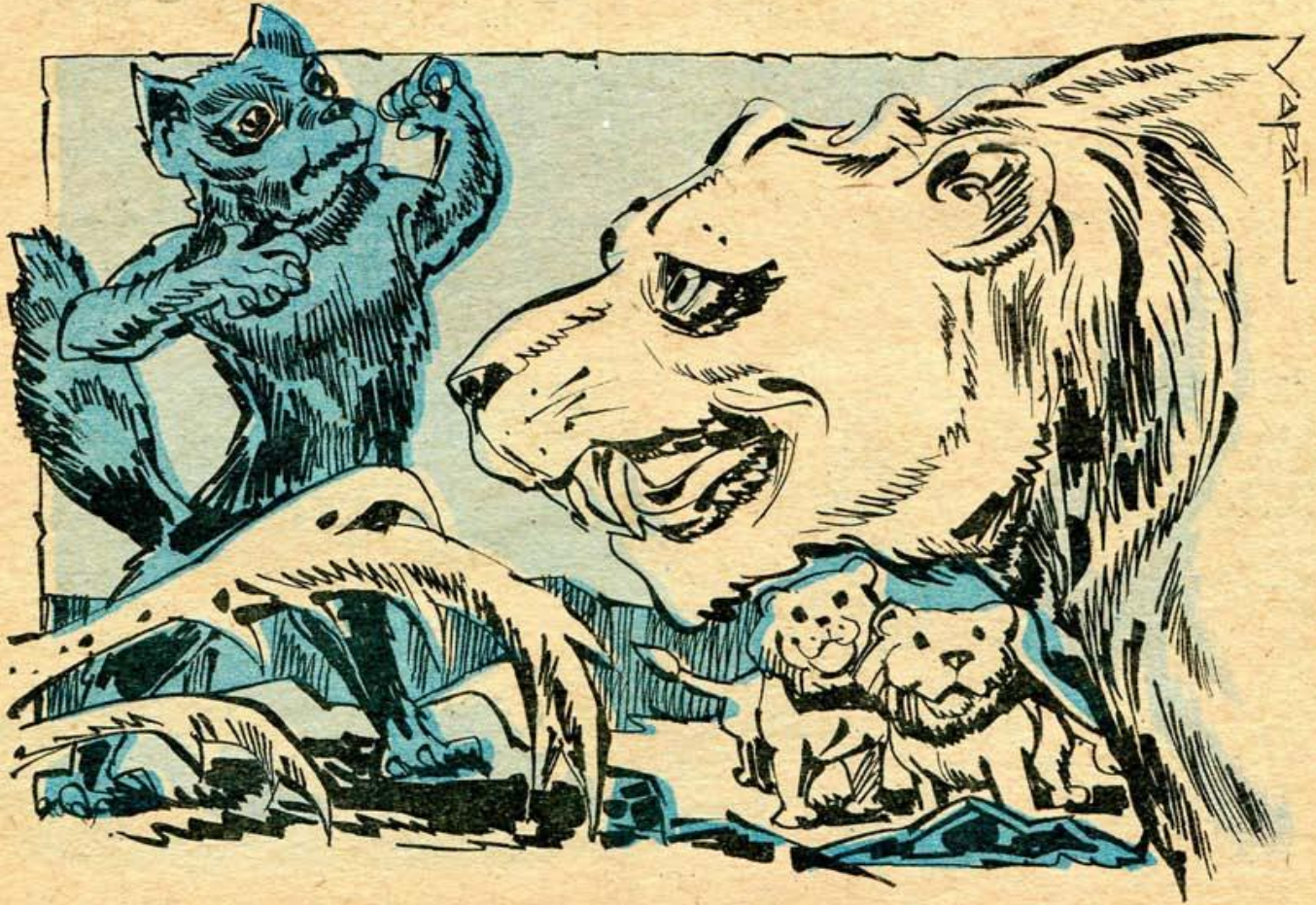
ধৈর্য আছে, জ্ঞানও হয়ত অনেক বেশী, দেখতে তুমি হয়ত ওদের থেকে সুন্দর। তবে তোমার বংশের কেউ কোনদিন হাতিকে মারেনি, মারতে পারবেও না। তাই আমি যা বলছি শোন, আসলে তুমি জন্মসূত্রে শেয়ালছানা। তোমাকে দেখে আমার কেমন দয়া হয়েছিল। আমার ছেলেরা এখনও জানেনা যে তুমি শেয়ালের বাচ্চা। তোমার ভালোর জন্যই বলছি তুমি চুপিচুপি পালিয়ে গিয়ে নিজের বংশের লোকের মধ্যে ঢুকে যাও। তা না হলে হঠাৎ কোনদিন জানতে পারবে সেদিন আর রক্ষে থাকবে না, আমার ছেলেরা তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে।"

সিংহীর কথা শুনে প্রাণের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে শেয়ালছানাটি ছুটে পালিয়ে অন্য শেয়ালের মধ্যে ঢুকে গেল।

এই কাহিনী শুনিয়ে রাজা কুমোরকে বলল, "আমার সেনাবাহিনীর লোক এখন জানেনা যে তুমি কুমোর। ওরা শুনলে কিন্তু হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে খেতে তোমাকে মেরে ফেলবে।" তারপর কুমোর আর এক মুহূর্ত সেখানে থাকেনি। বানর এই কাহিনী শুনিয়ে কুমীরকে বলল, "ওহে মূর্খ, তুমি বন্ধুকে মেরে ফেলে স্ত্রীর ভালবাসা পেতে চাও? কিন্তু তুমি তো জান না ব্রাহ্মণের বউ তার প্রেমিকের জন্যে কিভাবে স্বামীর পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।" কুমীরের অনুরোধে বানর বলল ব্রাহ্মণের সেই কাহিনী।
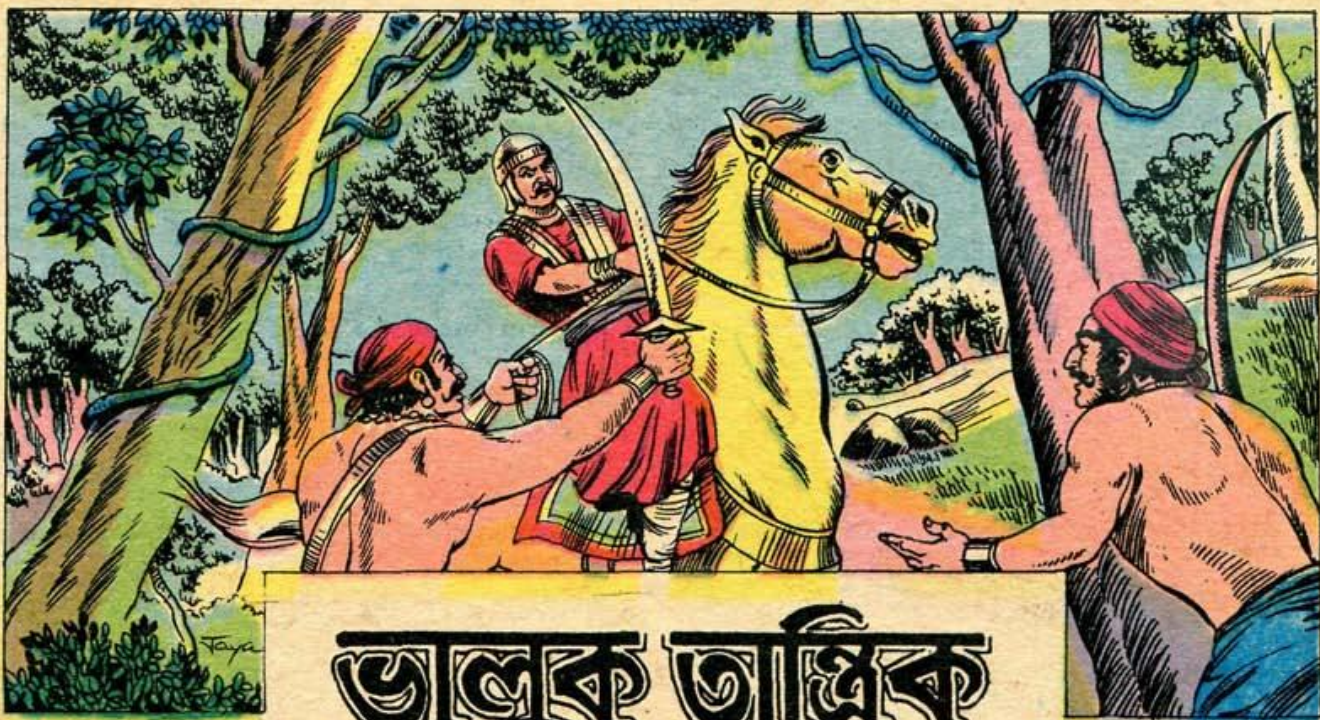
ভালুক তান্ত্রিক

ছয়

[চন্দ্রশীলা নগর আক্রমণ করতে রাজা দুর্মুখ বেরিয়েছিল। সঙ্গে জুটে গেল ভালুক তান্ত্রিক, চৌকিদার প্রভৃতি। নিজের পথে, নিজের ইচ্ছেমত চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দেহরক্ষীকে নিয়ে পালাতে লাগল রাজা দুর্মুখ। নাগমল নামে এক ডাকাত দড়ির ফাঁস পরিয়ে রাজা দুর্মুখকে টেনে নিল গাছের উপর। তারপর..............]

ডাকাতদলের দুজন গর্জন করতে করতে গাছের আড়াল থেকে সামনে বেরিয়ে এল। তখন রাজার দেহরক্ষী ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বলল, "বাবারা, আমার কোমরে যদিও একটা তরবারি ঝুলছে তবুও আমি কিন্তু নিরস্ত্র। আমাকে নিরস্ত্র হিসেবে ধরে তোমরা আমাকে আক্রমণ করো না।" রাজার দেহরক্ষী ভয়ে ভয়ে বলল।

ডাকাতদের সর্দার নাগমল বাঁহাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে ডানহাতে তরবারিটা রাজা দুর্মুখের দেহরক্ষীর গলায় ঠেকিয়ে বলল, "ওহে শোন, তুমি যদি সত্যি সত্যি তরবারি বের

করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে তাহলেও আমরা তোমাকে ভয় পেতাম না। ঐ দেখ, তোমার সামনে যে লোকটা যাচ্ছিল তার কি অবস্থা হয়েছে। ভয়ে লোকটা গাছে ঝুলছে। তোমাদের তুজনের পেছনে আর কেউ নেই তো ?"

এমন সময় রাজা গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে চিৎকার করে বলল, "এই অপমান অসহ্য। আমি কিছুতেই এই অপমান সহ্য করব না। এই কোথায় গেলি ? আমার দেহরক্ষীটা কোথায় পালিয়ে গেল ? দেহরক্ষী ! দেহরক্ষী !"

দেহরক্ষীর কোন জবাব দেওয়ার আগেই নাগমল তরবারি তুলে ধমক দিয়ে দেহরক্ষীকে বলল, "ওহে দেহরক্ষী তুমি একটু ঘোড়া থেকে নামো তো।"

দেহরক্ষী ঘোড়া থেকে নামল। তারপর নাগমল তার দলের যে লোকটা রাজাকে নিয়ে পড়েছিল তার উদ্দেশ্যে বলল, "ওহে মনে হচ্ছে, আমরা বেশ পয়সাওলা লোককেই পেলাম। ব্যাপারটা সাধারণ নয়। তুমি ঐ লোকটাকে গাছ থেকে নামাও। সাবধানে নামাবে। যেন চোট না পায়।"

গাছের ওপর থেকে নাগমলের লোক তুর্মুখকে আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামাল। গাছ থেকে নেমে রাজা তুর্মুখ কোমরে বাঁধা দড়িটাকে খোলার চেষ্টা করছিল। এসব লক্ষ্য করে নাগমলের দলের একজন রাজা তুর্মুখকে বলল, "কি ব্যাপার ? কোমরের দড়িটা খুলে গলায় পড়ার ইচ্ছে হয়েছে। আমরা যা জিজ্ঞেস

করব তা ঠিকভাবে না বলতে পারলে আমরাই তোমাকে লটকে দেব।"

ততক্ষণে নাগমল রাজার কাছে এসে, তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলল, "এত দামী পোশাক পরে এরকম বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে কাউকে দেখিনি। তোমার তরবারির খাপেও দেখছি অনেক আঁকজোঁক ও ছবি আছে। এত সুন্দর খাপ কোনদিন নজরে পড়েনি। মনে হচ্ছে তুমি খুব ধনী। তোমার কাছে টাকাপয়সা যা আছে সামনে রেখে দাও। তারপর তুমি যাকে দেহরক্ষী বলে চিৎকার করে ডাকলে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দশহাজার মুদ্রা আনাও। তা যদি না কর তাহলে তুমি বাঁচতে পারবে না।

রাজা দুর্মুখ এই ধরনের কথা ভাবতে ভাবতে তার যেন স্থান, কাল, পাত্র লোপ পেয়েছিল। এমন সময় ডাকাত সর্দার নাগমল গম্ভীর গলায় বলল, "কিভাবে আমার খপ্পর থেকে পালাবে তার তাল করছ?" বলেই তরবারিটা উঁচুতে তুলে ধরল।

"না, না, আমি পালানোর কথা
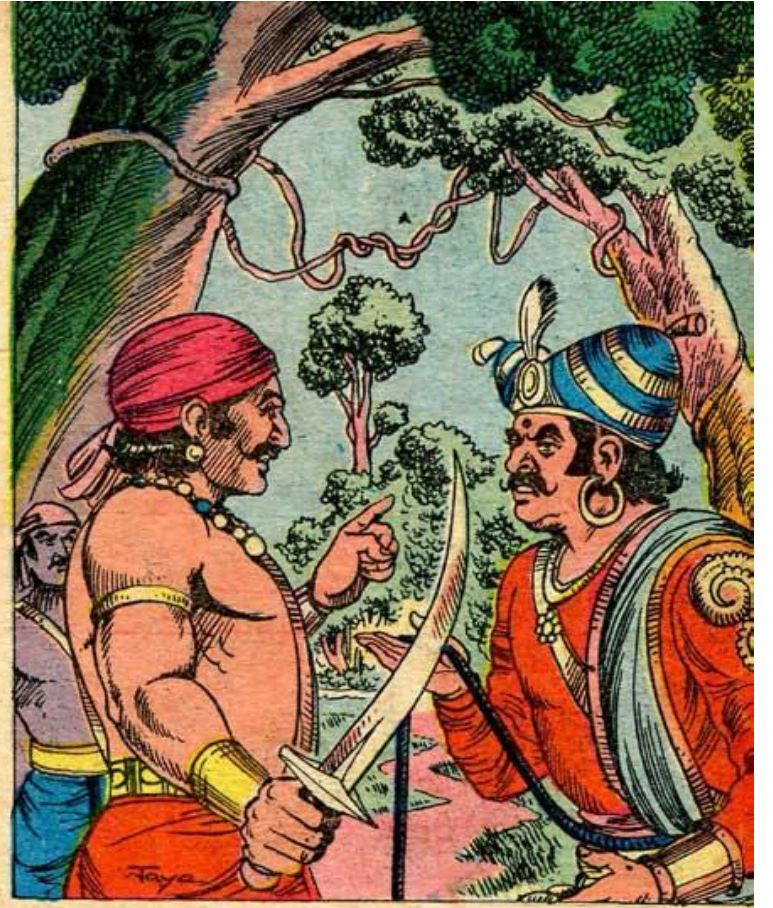
ভাবছি না। আমার নাম দুর্জয় শেঠ। উদয়গিরি নগরে আমার বাস। এখন আমার কাছে কানাকড়িও নেই।" এক নিশ্বাসে রাজা দুর্মুখ বলে ফেলল।

এই জবাব শুনে নাগমল অবাক হয়ে গেল। অবিশ্বাসের দৃষ্টি হেনে সে বলল, "সঙ্গে এত দামী পোশাক পরে আছ, সঙ্গে দেহরক্ষী আছে। তাহলে এখানে কিছু হবে এই ভয়েই সঙ্গে কিছুনাওনি। এই তো?"

ডাকাত সর্দারের কথা শেষ হতে না হতেই চৌকিদারের আর্তনাদ দূর থেকে
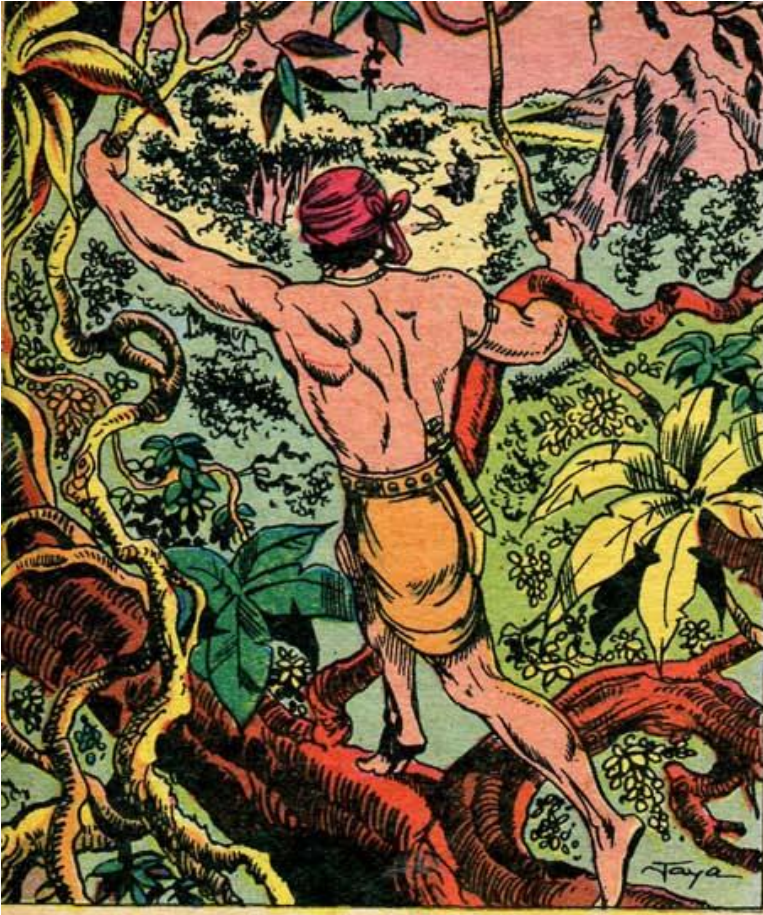
ভেসে এল। ঐ আর্তনাদ শুনে রাজা দুর্মুখ এবং তার দেহরক্ষীর মুখ শুকিয়ে গেল। দেহরক্ষী হাঁকপাঁক করে বলল, "মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে চৌকিদারের বাহন পথ হারিয়ে ফেলে আর্তনাদ করছে। হয়ত সে আমাদের গন্ধ পেয়ে এদিকেই আসছে।"

ডাকাত সর্দার এক ফাঁকে নিজের লোকের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় ওদের কাছে ডেকে বলল, "শুনছ ওদের কথা? লোকটা নিজের নাম বলেছে দুর্জয় শেঠ। আবার একে ঐ লোকটা ডাকছে মহারাজা বলে। আর একটা কথা কানে এল চৌকিদারের বাহন। সেটা আবার পথ ভুলেছে। না যত সহজ ভেবেছিলাম তত নয়।"

রাজা দুর্মুখ ভেবে পেল না কি বলবে। এমন সময় শুনতে পেল ভালুক এবং হাতির চিৎকার ও ডাক। হঠাৎ এই দুটো জন্তুর ডাক শুনে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে নাগমল তার দলের একজনকে বলল, "শোন, তুমি ঐ গাছে উঠে দেখ তো কিছু চোখে পড়ে কি না। আমার মনে হচ্ছে শুধু ভালুক এবং হাতি নয়, একটি মানুষের গলাও এর সঙ্গে মিশে আছে। তাছাড়া এদের কথা আমার একটুও বিশ্বাস হচ্ছে না।"

তার কথা শেষ হতেই ওদের একজন ঐ গাছে উঠে পরক্ষণেই লোকটা বলল, "সর্দার, দুর্জয় শেঠ আর তার চাকর যা বলেছে তা সত্য। আমি দেখতে পাচ্ছি একটা হাতি। হ্যাঁ হাতিই বটে। গাছের আড়াল দিয়ে পুরো হাতিটা দেখা যাচ্ছে না।

দুর্মুখ বলল, "সর্দার, এখানে আমাদের থাকা নিরাপদ নয়। যত তাড়াতাড়ি পালাব ততই মঙ্গল। অর্থের লোভে পড়ে জীবন দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

দেহরক্ষী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়ায় উঠে নাগমলকে বলল, "সর্দার, এই মুহূর্তে তুমি যদি রাজার জীবন রক্ষা কর তাহলে তোমাকে অর্ধেক রাজত্ব দান করতে পারেন। আমি ঘোড়ায় চড়ে ঝড়ের বেগে রাজধানীতে যাচ্ছি। মহারাজ, আমি রাজধানী থেকে সেনাবাহিনী নিয়ে আসব?"

"সে কাজ তো আমিও করতে পারি। কিন্তু মুশকিল হল এই গভীর বন থেকে বেরুনোর পথ আমার জানা নেই। কোন্ পথে গেলে যে রাজধানীতে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারব আমি তা জানি না।"

নাগমল তার অনুচরদের ইশারা করে রাজা দুর্মুখ ও তার দেহরক্ষীদের দিকে রক্তচক্ষু করে তাকিয়ে বলল, "ওহে, তোমাদের দুজনের কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমাদের দুজনের মাথায়
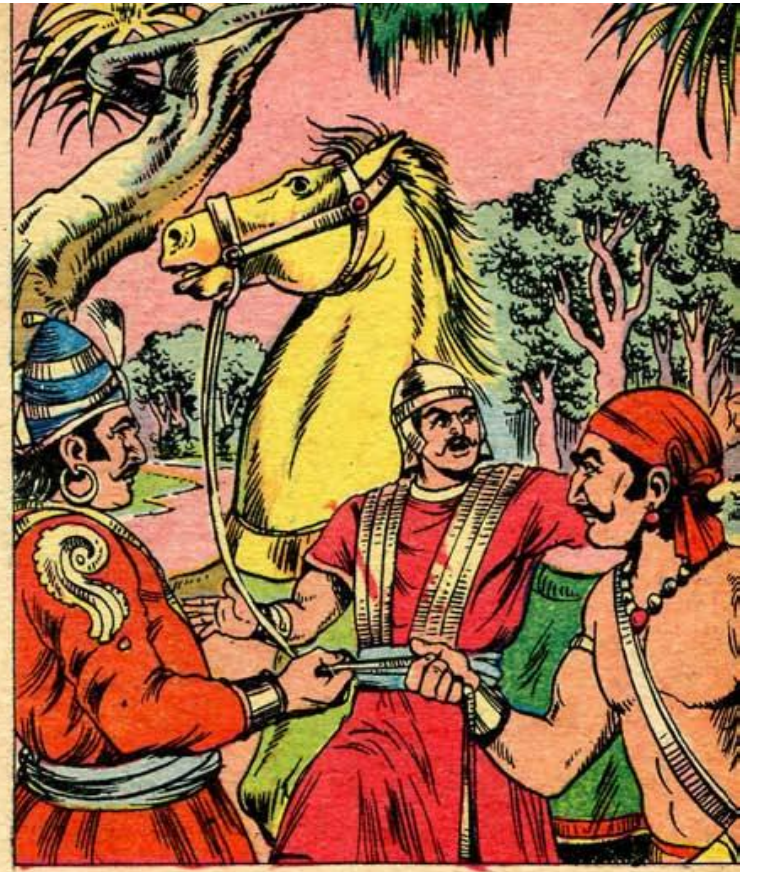
গোবর ভরা। এদিকে আক্রমণকারী এগিয়ে আসছে আর তোমরা ঠিক এই সময় রাজধানী থেকে সেনাবাহিনী আনতে যাচ্ছ। তোমাদের মগজে বুদ্ধি বলে কোন বস্তু আছে? দাঁড়াও তোমাদের মজা দেখাচ্ছি। এই কে আছিস, এদের দুজনকে ভাল করে কষে বেঁধে টানতে টানতে ঐ পাহাড়ের গুহায় নিয়ে যা তো। ওখানে নিয়ে গেলে এদের আসল পরিচয় জানতে পারব।" নাগমল ঐ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।
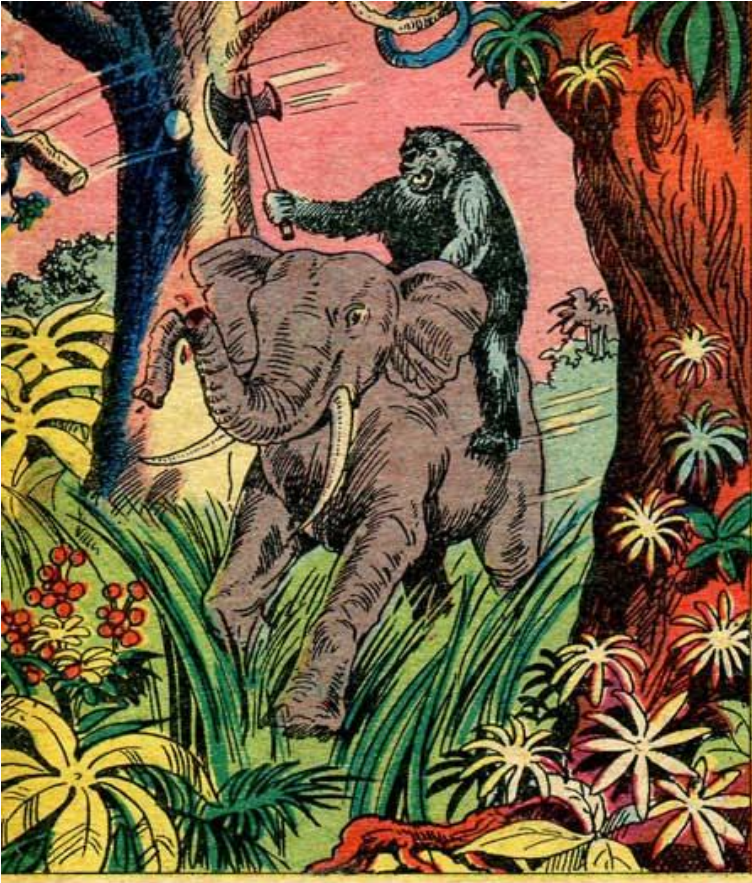
নাগমলের নির্দেশমত তার সঙ্গীরা রাজা দুর্মুখ ও তার দেহরক্ষীকে বেঁধে পাহাড়ের উপর টেনে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। এমন সময় হাতির পিঠে চেপে সেখানে এসে দুর্মুখকে দেখে বলল, "এই তো পেয়েছি। তোমার জন্যে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে।" তাকে দেখে নাগমল এবং তার অনুচররা ভয় পেল। ওরা একটা গুহার ভেতরে ঢুকে গেল। চৌকিদারের সেখানে পৌঁছানোর আগেই ওরা গুহার মুখ বড় পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিল। চৌকিদারের ভালুক ঐ গুহার কাছে গিয়ে পাথরটাকে পা দিয়ে দুএকবার ঠেলল। তারপর চৌকিদার বলল, গুহায় কে আছ? বেরিয়ে এস। আমি আর কিছু চাই না শুধু দুর্মুখের মুণ্ডু চাই।"

তার কথা শুনে নাগমল তার অনুচরদের বলল, "এ তো অদ্ভুত ব্যাপার। একটা লোক শুধু একটা মুণ্ডু নিয়েই খুশী। কারণটা কি?" তারপর সে রাজা দুর্মুখকে বলল, "ওহে, শুনেছি এই অরণ্যের শেষে রাজা দুর্মুখের দেশ শুরু হয়েছে। আমি কোনদিন এই অরণ্যের বাইরে যাইনি। তাই ঐ রাজাকে কোনদিন দেখিনি। ভাল কথা তুমিই সেই রাজা দুর্মুখ নও তো?"

"দেখ, আমি তো একবার বলেছি আমার নাম দুর্জয় শেঠ। জীবজন্তু নিয়ে যাদের কারবার তাদের কথায় এতটা বিশ্বাস করা ঠিক নয়। ভাগ্যিস বেঁধে হোক টেনে হোক আমাদের তোমরা এই গুহায় নিয়ে এসেছ। যাক শোন, তুমি যে দশহাজার মুদ্রা চেয়েছো আমি

তা দেব। এই গুহা থেকে অন্য কোন পথে বেরনো যায় কিনা ভাল করে দেখ।" রাজা দুর্মুখ বলল।

রাজার কথা শেষ হতে না হতেই দেহরক্ষী বলল, "সর্দার, রাজা যা বলেন তাই করেন।"

"চুপ কর। আমার মনে হয়েছে তোমার মাথায় ভূত চেপেছে। সেই তখন থেকে আমাকে মহারাজা সম্বোধন করছ। ফের যদি ঐ শব্দ মুখে আন প্রকাশ্যে তোমার শিরশ্ছেদ করব। সাবধান।" দুর্মুখ বলল।

তার কথা শুনে চমকে উঠে নাগমল নিজের অনুচরদের বলল, "ওহে, সৌভাগ্যবশতই হোক আর দুর্ভাগ্যবশতই হোক মনে হচ্ছে আমরা রাজা দুর্মুখকে ধরে ফেলেছি। যতদূর জানি, রাজা ছাড়া আর কেউ কাউকে প্রকাশ্যে শিরচ্ছেদ করতে পারেনা।"

এদিকে গুহার মুখের পাথরটাকে সরাবার জন্য চৌকিদার তার জন্তু জানোয়ারদের নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এই ফাঁকে নাগমলের মতিগতি দেখে রাজা দুর্মুখ তাকে বলল, "সর্দার,
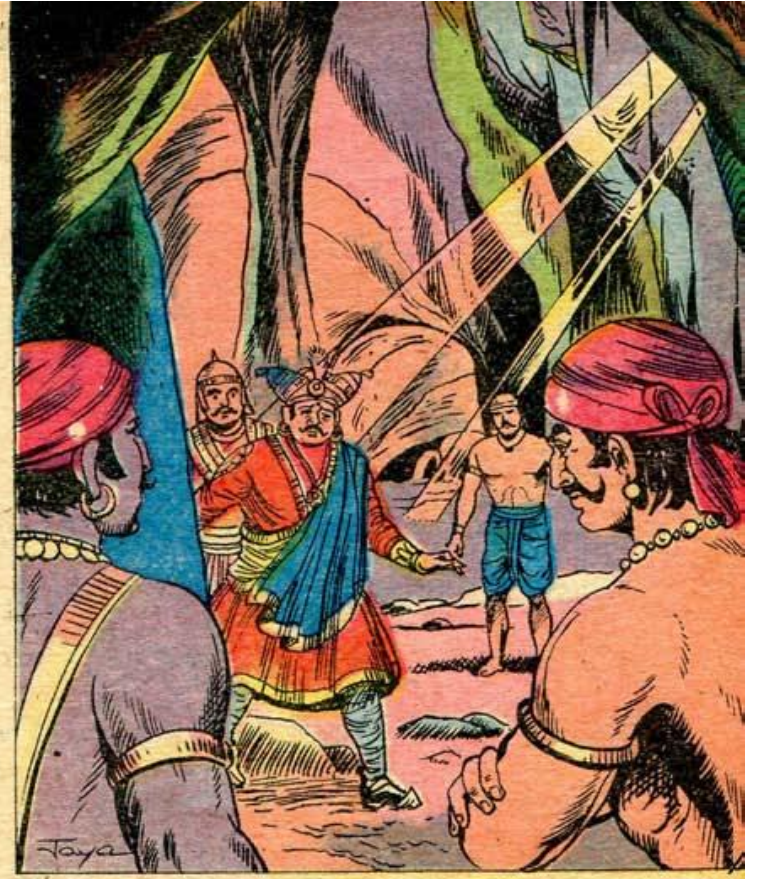
মনে হচ্ছে আমার সম্পর্কে তোমার সন্দেহ জেগেছে। এই অরণ্যে ঢোকার পর থেকে আমার চাকরটা ভুল বকছে। তাই হয়ত তোমার মনে নানারকম সন্দেহ জাগছে।"

রাজার কথা শেষ হতে না হতেই দেহরক্ষী বলল, "মহারাজ আমাকে ক্ষমা করুন। কখন যে কোন্ কথা বলতে হবে আর কখন যে কোন কথা চেপে রাখতে হবে তা জানি না।"

নাগমল বিরক্ত হয়ে বলল, "এখন তুমি রাজাই হও আর শেঠ হও আমার

কিছু যায় আসে না। বলেই নিজের অনুচরদের বলল, "দেখ, হাতি আর ভালুক যদি এখানে ঢুকে পড়ে তাহলে আমাদের বাঁচার কোন আশা নেই। তার চেয়ে চল আমরাই পাথর সরিয়ে আগে আক্রমণ করি।"

তার কথা শুনে নাগমলের অনুচররা কিছু বলার আগেই দেহরক্ষী বলল, "নাগমল, চৌকিদারের ভালুকটা যে সে ভালুক নয়। ওটা ভালুকতান্ত্রিকের সৃষ্ট জন্তু। তার ক্ষমতা অসীম।

ঠিক সেই সময় গুহার মুখের পাথরটা সরে গেল। বাইরে থেকে গুহার ভেতরে আওয়াজ এল: "ওহে দুর্মুখ বেরিয়ে এস। তোমার মুণ্ডু চাই।"

নাগমল এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, "দেখ, একার জন্যে আমরা সবাই মরতে পারিনা। এর নাম দুর্জয় হোক অথবা দুর্মুখ হোক একে বাইরে ঠেলে দিলে আমরা সবাই প্রাণে বাঁচব।"

তারপর নাগমলের অনুচর দুর্মুখকে ধরে গুহার বাইরে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। এমন সময় পাশের গুহা থেকে গুরুগম্ভীর গলায় আওয়াজ ভেসে এল, "কি হচ্ছে ওখানে? এপাশের গুহায় উগ্রদণ্ড নামে একজন মহারাক্ষস যে আছে সে কথা কি তোমরা ভুলে গেছ?"

পরক্ষণে গুহার বাইরে থেকে আওয়াজ এল, "তুমিই সেই রাক্ষস? তোমারই নাম উগ্রদণ্ড? কিছুক্ষণের মধ্যেই ভালুকতান্ত্রিকের মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন অস্ত্র তোমার গলা কেটে ফেলবে। সাবধান।"

[চলবে]
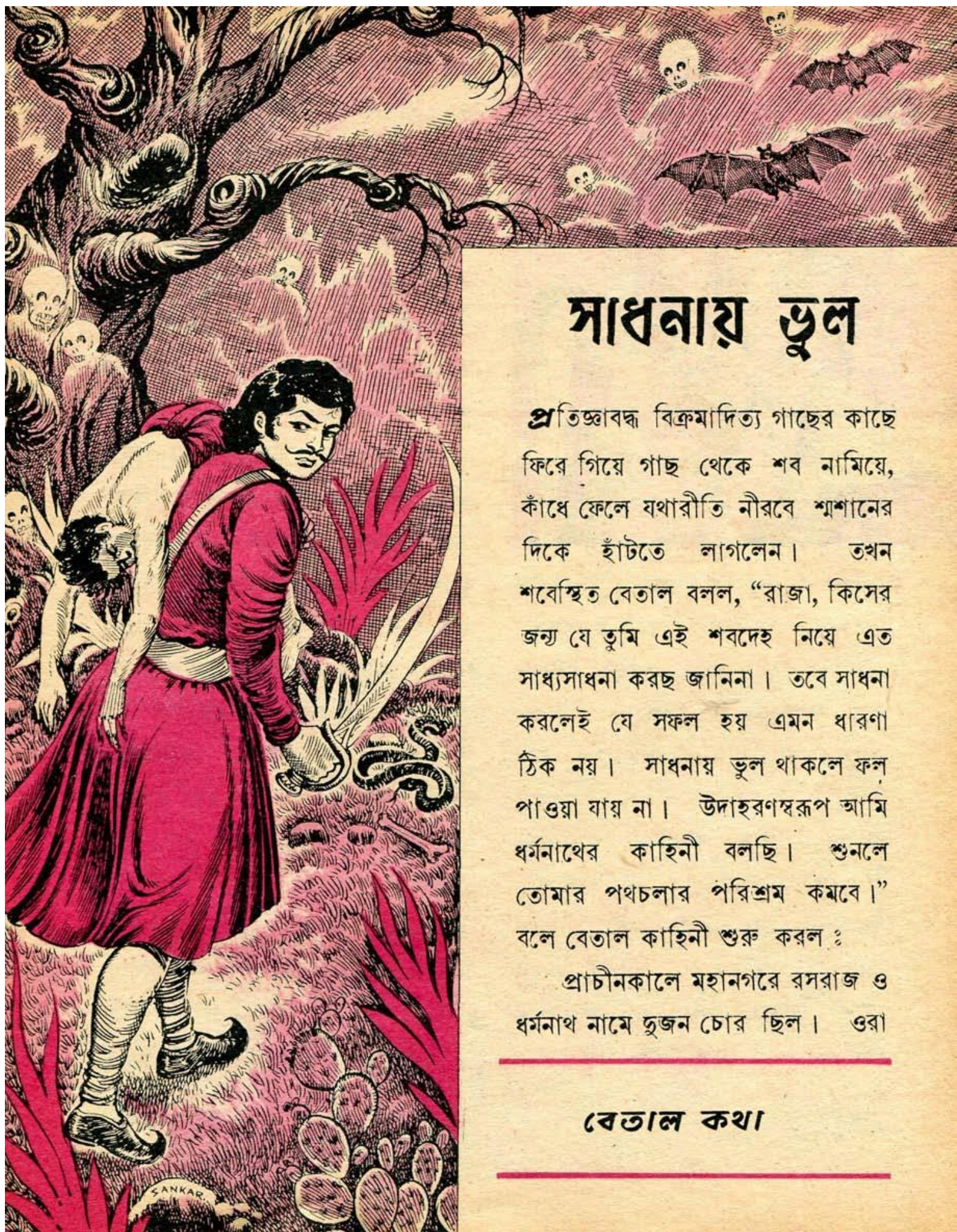
সাধনায় ভুল

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে গাছ থেকে শব নামিয়ে, কাঁধে ফেলে যথারীতি নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগলেন। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, কিসের জন্য যে তুমি এই শবদেহ নিয়ে এত সাধ্যসাধনা করছ জানিনা। তবে সাধনা করলেই যে সফল হয় এমন ধারণা ঠিক নয়। সাধনায় ভুল থাকলে ফল পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ আমি ধর্মনাথের কাহিনী বলছি। শুনলে তোমার পথচলার পরিশ্রম কমবে।" বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল:

প্রাচীনকালে মহানগরে রসরাজ ও ধর্মনাথ নামে দুজন চোর ছিল। ওরা

বেতাল কথা
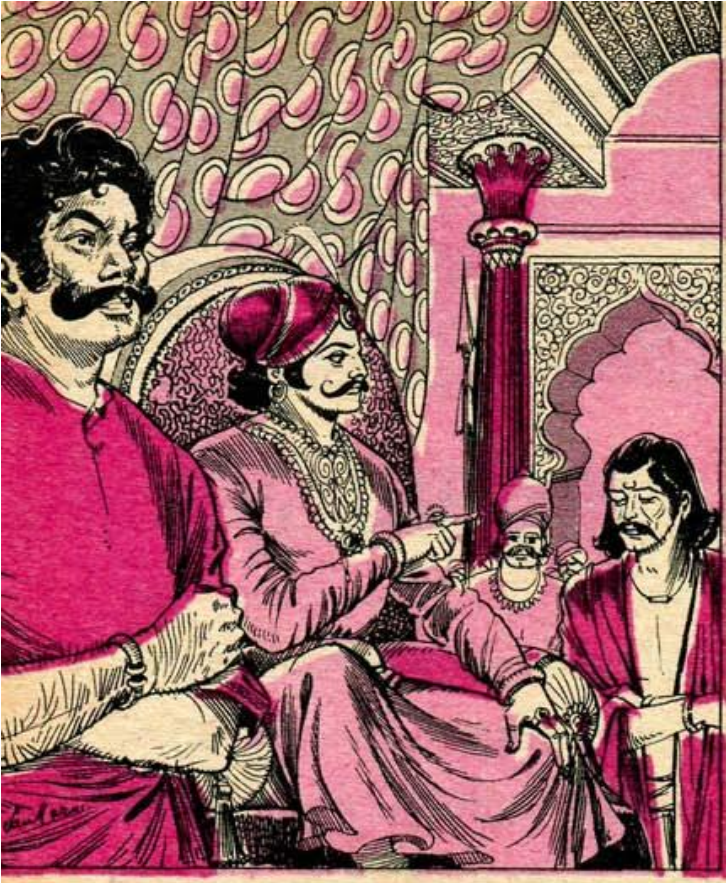
দুজনে মিলে বড় বড় চুরিডাকাতি করত। বনে জঙ্গলে ছিনতাই করত। এইভাবে দুজনে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে গিয়েছিল। রসরাজ নিজের ভাগের টাকা দিয়ে বাড়ি ঘর করে সম্পত্তি বাড়াতে লাগল। কিন্তু ধর্মনাথ ঐ টাকা জমিয়ে রাখত না। সে ধর্মশালা করেছিল। ঐ ধর্মশালায় প্রতিদিন বহু গরীব মানুষ এসে পেটভরে খেয়ে যেত। ধর্মনাথ সাধুর বেশে দিনের বেলা ঐ ধর্মশালায় থাকত, সেবার কাজ করত আর রাত্রে রসরাজের সঙ্গে চুরি করতে বেরতো।

কিছুদিনের মধ্যেই ধর্মনাথের সুনাম সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। ধর্মনাথের কথা রাজার কানেও গেল। রাজা ধর্মনাথকে রাজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে তাকে 'ধর্মদাতা' উপাধি দিল।

এই ধর্মদাতাই যে একজন চোর তা কেউ জানত না। এমন কি রসরাজও জানত না।

কয়েক মাসের মধ্যেই সারা দেশে চুরির উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় রাজা সমস্যায় পড়ল। শেষে রাজা ঘোষণা করল চোরকে যে ধরিয়ে দেবে তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার দেওয়া হবে। ঘোষণা শুনেই রসরাজ ধর্মনাথই যে চোর তা রাজাকে জানিয়ে দিল।

রসরাজ ভেবেছিল ধর্মনাথকে ধরিয়ে দিলে শুধু যে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাব তাই নয়, এর পর চুরির ভাগ দিতে হবে না।

রাজার লোক গিয়ে ধর্মনাথকে বন্দী করল। রাজার সামনে ধর্মনাথ চুরিডাকাতির কথা স্বীকার করে নিল।

ধর্মনাথের বন্দী হওয়ার পর দুটো

ঘটনা লক্ষ্য করা গেল। চুরি হতে লাগল, ধর্মশালায় খাওয়ানো বন্ধ হয়ে গেল। যে সাধু খাওয়াতো তার আর পাত্তা ছিল না। এই কথা জানার পর রাজা ঐ ধর্মশালায় খাওয়ানোর ব্যবস্থা করল।

কিন্তু চুরি চলতে থাকায় রাজা রসরাজকে বন্দী করে আনার নির্দেশ দিল। রসরাজ অবাক হয়ে রাজার সামনে দাঁড়াতেই রাজা বলল, "রসরাজ, দু-একদিনের মধ্যেই ধর্মনাথের বিচার হতে পারে। বিচারের সময় তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে।"

রাজার এই কথার পর রসরাজকে থাকতে হল কারাগৃহে।

দিনের পর দিন গেল কিন্তু ধর্মনাথের বিচার হল না। ফলে রসরাজকে কারাগারে আটকে থাকতে হল। ধর্মনাথকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে হঠাৎ একদিন রাজা ধর্মনাথকে ধর্মশালার অধিকর্তার পদে নীয়োগ করল। রসরাজকে কারাগারে রাখার পর থেকে দেশে চুরি আর হল না।

রসরাজ কিন্তু মুক্তি পেল না।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, ঐ রাজাটা কি ধরনের রাজা?

ধর্মনাথ স্বীকার করেছিল যে সে চোর। তবু তাকে শাস্তি না দিয়ে ধর্মশালার অধিকর্তার পদে নীয়োগ করল। আর ধর্মনাথকে যে ধরিয়ে দিল সেই রসরাজকে পুরস্কার না দিয়ে তাকে সারা জীবন কারাগারে বন্দী করে রেখে দিল। রাজার এই ধরনের আচরণের কারণ কি—তা জানা সত্ত্বেও যদি না জানাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

জবাবে বিক্রমাদিত্য বললেন, "ঐ রাজা সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন রাজা ছিলেন। যে লোকটা দিনে সাধু সেজে ধর্মশালায় বসে থাকে সেই যে রাত্রে চুরি করে এটাও রাজা হয়ত জেনেছিলেন। তবু ধর্মনাথের মধ্যে দানধর্ম করার প্রবল ইচ্ছা যে ছিল সেটা রাজা লক্ষ্য করেছিলেন। ধর্মনাথকে বন্দী করার পর ধর্মশালায় কোন সাধু এল না তখন রাজার কাছে সবকিছু নিশ্চয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। অপর পক্ষে ধর্মনাথকে ধরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজার চোখ ছিল রসরাজের উপর। রসরাজ চুরি করা টাকায় অগাধ বিষয়সম্পত্তি করেছিল। ধর্মনাথের বন্দী হওয়ার পরেও দেশে যখন চুরি হতে লাগল তখন রাজা রসরাজকে বন্দী করলেন। তাকে বন্দী করার পর আর চুরি হল না। এইসব ঘটনা বিচার করে রাজা ধর্মনাথকে ঐ পদে বসালেন এবং রসরাজকে বন্দী করলেন।"

রাজা এইভাবে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে ফিরে গেল সেই গাছে। (কল্পিত)
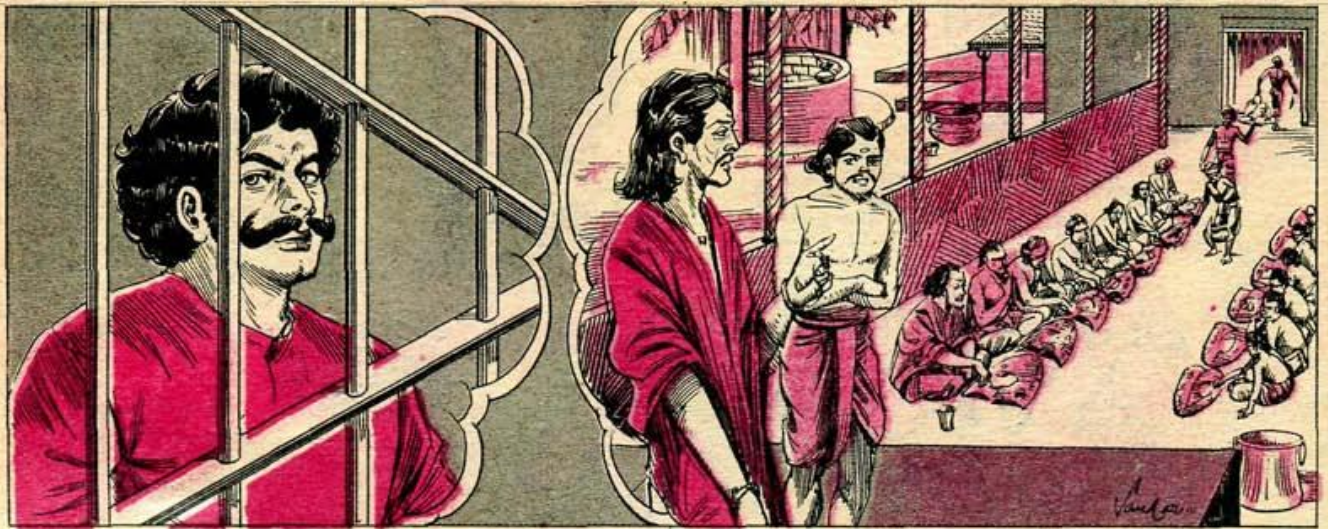
বউদের প্রভাব

সোমনাথ ও রামনাথ দুই ভাই। বড় সোমনাথ, ছোট রামনাথ। সোমনাথ কুঁড়ে আর রামনাথ কাজের। সে ক্ষেতেখামারে খাটত। তার পরিশ্রমে পরিবারের সকলের খরচ চলত।

সোমনাথের বউ চালাক ছিল। সে তার স্বামীকে বলল, "তোমার ছোটভাই দিনরাত খেটে রোজগার করবে আর তুমি বসে বসে খাবে, এতে তোমার লজ্জা করে না? কেন তুমিও তার মত ক্ষেতে খামারে খাটতে পার না? তোমার গায়ে কি তার চেয়ে কম জোর আছে?"

রামনাথের বউ লক্ষ্য করেছিল তার স্বামী দিনরাত খাটে। এত খাটনির ফলে তার স্বামীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে। সে প্রায় তার স্বামীকে বলত, হ্যাঁ, চেহারাটা একবার কি হয়েছে দেখেছো? তোমার দাদা এত বিশ্রাম করতে পারে তুমি একদিন বিশ্রাম করতে পার না?" এইভাবে সোমনাথের বউ সোমনাথকে রামনাথের বউ রামনাথকে একই কথা বলে যেতে লাগল। কিছুকাল পরে দেখা গেল স্ত্রীর কথা শুনে সোমনাথ দিনরাত খাটতে লাগল আর রামনাথ কুঁড়ে হয়ে বসে বসে দিন কাটাতে লাগল।
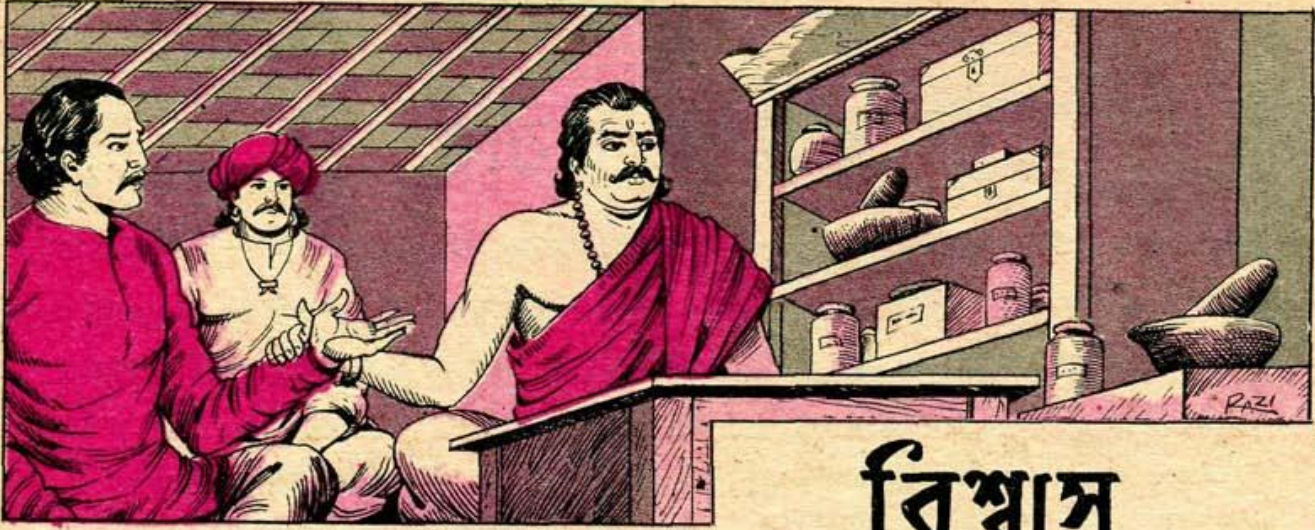
বিশ্বাস

কোন এক দেশে রামশাস্ত্রী নামে এক কবিরাজ ছিল। যত পুরাতন রোগ হোক না কেন তার ওষুধে রোগ সেরে যেত। গাছগাছড়ার ছাল আর মূল এই ছিল তার ওষুধের উৎস। লোকের মুখে মুখে রামশাস্ত্রীর প্রশংসা ছড়াতে লাগল। গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে তার নাম হয়ে গেল। রামশাস্ত্রী কোনদিন টাকাপয়সার দিকে নজর দেয়নি। রোগ সারার পর যে যা দিত তাতেই সে খুশী থাকত। যতই কম দিক অনেকে দিত বলে পুষিয়ে যেত।

রামশাস্ত্রীর ছেলের নাম ছিল গোবিন্দ। গোবিন্দকেও উপযুক্ত বৈদ্য করে তোলার ইচ্ছা ছিল রামশাস্ত্রীর। কিন্তু গোবিন্দর ধারণা ছিল তার বাবার যতই সুনাম থাক, তার বাবা যে চিকিৎসা করছে তা শাস্ত্রসম্মত নয়। এই নিয়ে মনে মনে সে বাবার উপরে কিছুটা বিরক্ত ছিল। তার ধারণা, তার বাবা আসলে একটি হাতুড়ে বৈদ্য। বাবা যখন তাকে বৈদ্য হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করল তখন ছেলে বলল, "দেখ বাবা, বৈদ্যগিরি যদি করতে হয় তাহলে আগে আমি নগরে গিয়ে ভালো করে শিখে আসব। পাড়াগাঁয়ে চিকিৎসা করে শেখা যায় না।" অগত্যা রামশাস্ত্রী গোবিন্দকে নগরে পাঠিয়ে দিল।

প্রচুর টাকাপয়সা খরচ করে

অনুরাধা দেবী

বৈদ্যশাস্ত্র শিখে গোবিন্দ বাড়ি এল।

রামশাস্ত্রী ছেলের ফিরে আসার পর তার কাছে রুগীদের পাঠাত। এদিকে বৈদ্যশাস্ত্র যতই পড়ুক গোবিন্দ হাতেনাতে চিকিৎসার ব্যাপারে তেমন কিছু জানত না। গোবিন্দ নগরে গিয়ে যতই খরচ করে আসুক না কেন তার হাতে যে কোন জটিল রুগীকে ছেড়ে দিয়ে যে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না তা কিছুদিনের মধ্যেই রামশাস্ত্রী বুঝতে পারল।

গোবিন্দ কিন্তু একটি ধারণা পোষণ করত যে তার বাবার খ্যাতির ফলে তার নিজের খ্যাতি চাপা পড়ে যাচ্ছে। একদিন রামশাস্ত্রী গোবিন্দকে বলল, "বাবা গোবিন্দ, তুমি এক কাজ কর, এখন থেকে তুমি নগরে গিয়ে রুগীদের চিকিৎসা কর।"

বাপের এই কথা গোবিন্দের পছন্দ হল। নগরে গিয়ে কিছুদিন থাকার ফলেই গোবিন্দর কঠিন অসুখ করল। রামশাস্ত্রী ছুটে গিয়ে ওষুধ দিল বটে কিন্তু তাতে তার অসুখ সারল না। তখন রামশাস্ত্রীর এক শিষ্য এসে
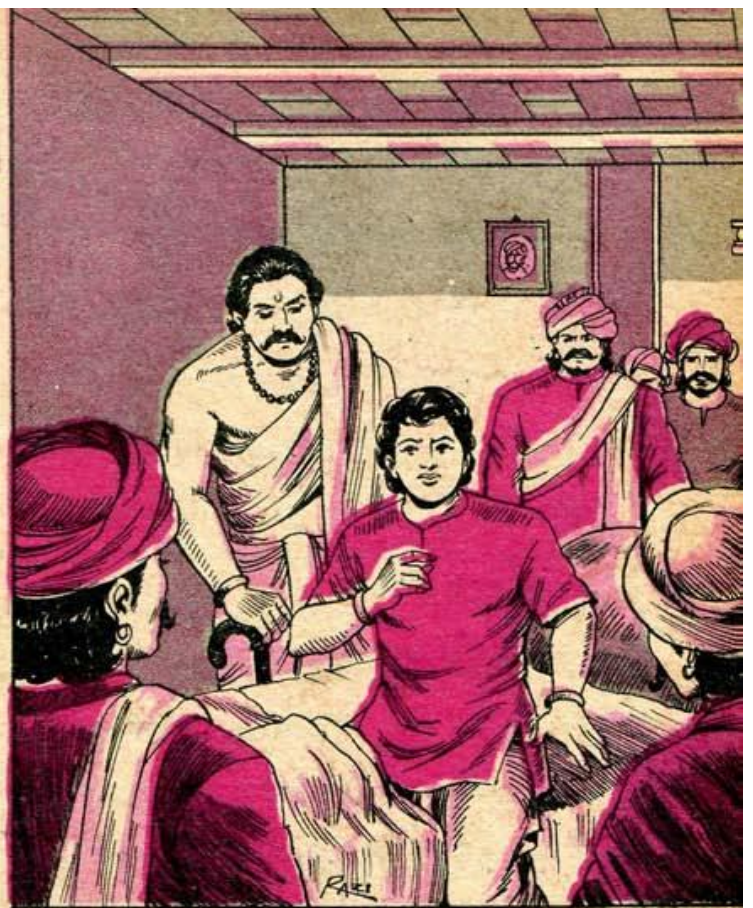
গোবিন্দের চিকিৎসা করল। ঐ শিষ্যের নাম ছিল সমর।

সমরের ওষুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ সেরে উঠতে লাগল। একমাস ধরে রামশাস্ত্রী যে অসুখ সারাতে পারেনি সেই অসুখ সমর দুদিনেই অনেকখানি কমিয়ে ফেলেছিল। ফলে সমরকে এগিয়ে এসে অনেকেই প্রশংসা করতে লাগল।

গোবিন্দ সেরে ওঠার পর সমর নিজের বাড়ি ফেরার জন্য তৈরী হল। কিন্তু রামশাস্ত্রী তাকে বাধা দিয়ে বলল,

"আর বাড়ি না গিয়ে তুমি এখানেই থেকে যাও। এখানকার বৈদ্যরা তোমার সহযোগিতা পেলে খুশী হবে। তুমি এখানে থাকলে লোকের খুবই উপকার হবে।"

সবিনয়ে হাসতে হাসতে সমর বলল, "আপনি তো আছেন—আমার আর কি দরকার।"

"আমি কালকে এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি।" রামশাস্ত্রী বলল।

"সেকি! এই গ্রামে আপনার কত খ্যাতি আর এই অবস্থায় আপনি গ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন?" সমর বলল।

"দেখ, এই গ্রামের লোক আর আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারবে না। আমি যখন আমার ছেলেকে সারাতে পারিনি তখন ওরা কি করে ভাববে যে আমি অন্যকে সারাতে পারব!" রামশাস্ত্রী বলল।

"কিন্তু আমি তো অন্য কোন ওষুধ দিইনি। আপনি যে ওষুধ আমাকে শিখিয়েছিলেন আমি সেই ওষুধই দিয়েছি। তাতেই আপনার ছেলে সেরে উঠেছে।" সমর বলল।

"ঠিক কথা। কিন্তু আমার ওষুধে কাজ হলনা তার কারণ আমার ওষুধে আমার ছেলের বিশ্বাস ছিল না। ঠিক এটাই প্রমাণ করার জন্য আমি তোমার মত শিষ্যকে এনেছি। আমার যা জানার ছিল তা জানা হয়ে গেছে। এখন থেকে আমি অন্য গ্রামে থাকব।" রামশাস্ত্রী সস্ত্রীক অন্য গ্রামে চলে গেল। সেখানে সমর দিনের পর দিন সুখ্যাতি অর্জন করে চিকিৎসা করতে লাগল।
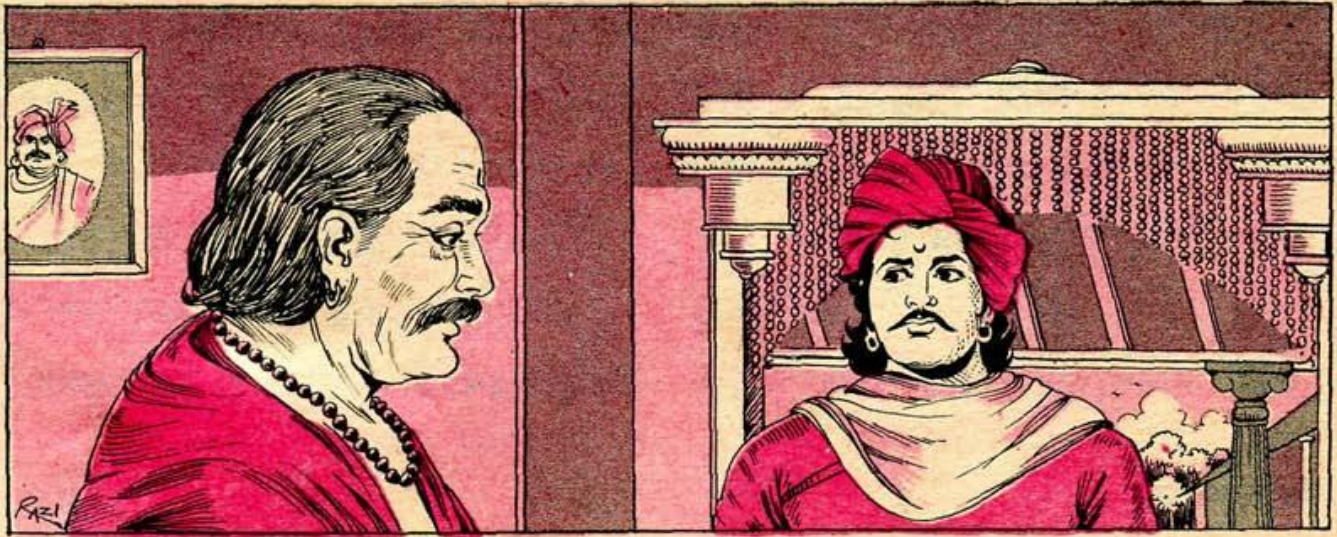
বিপদের বন্ধু

প্রাচীনকালে কোন এক দেশে ঝড় বৃষ্টি বন্যা হওয়ার ফলে অসংখ্য মানুষ মারা যায় ও প্রচুর বিষয়সম্পত্তি নষ্ট হয়। প্রজারা রাজার কাছে সাহায্য চাইল, রাজাও সাহায্য করতে চাইল, তবে কিভাবে ঠিক করে উঠতে পারল না। মন্ত্রীর পরামর্শ তার পছন্দ হল না।

রাজা গুপ্তচরদের মাধ্যমে কার কতটা সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে তা জানতে পারল। প্রজারা জিনিস নিলে খুশী হবে না টাকা নিলে খুশী হবে তাও জানার জন্য রাজার নির্দেশে গুপ্তচররা বেরিয়ে পড়েছিল। রাজা জানতে পারল যে অর্ধেক সংখ্যক প্রজা টাকা চায় বাকি অর্ধেক জিনিস চায়। কোন্‌টি করা উচিত তা ঠিক করার জন্য রাজা কয়েকজনের উপরে ভার দিল। ওরা দিন কয়েকের মধ্যে জানাল, জিনিস না দিয়ে টাকা দিলেই ভাল হবে।

কিছুদিন পরে রাজা ছদ্মবেশে ঘোরাঘুরি করে কিছু প্রজার মন্তব্য শুনে রেগে ফিরে এসে মন্ত্রীকে বলল, "আশ্চর্য! দুহাতে আমি টাকা বিলিয়েছি তা সত্ত্বেও প্রজারা সুদর্শনের নাম করছে! সুদর্শন মাত্র চারদিন প্রজাদের ভাত খাইয়েছে এতেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।"

"বন্যায় যারা সব হারিয়েছে তারা পেট ভরে খেতে পেলে—প্রশংসা করবেই মহারাজ।"

বড় হল ছোট

শান্তিবন নামে একটি দেশ ছিল। সেই দেশে ছিল শ্রীপতি ও ভূপতি নামে দুইবন্ধু। কিন্তু গ্রাম্য রাজনীতির প্রভাবে পড়ে ওরা একে অন্যের শত্রু হয়ে গেল। একে অন্যের কথা মুখে আনত না। এমনকি একে অন্যকে মেরে ফেলতে পারলে যেন বাঁচে।

ওরা অবশ্য বরাবর এরকম ছিলনা। ছেলেবেলায় ওরা পরপস্পরের শুধু বন্ধুই ছিলনা, এবেলা ওবেলা দেখা না হলে কারুর পেটের ভাত হজম হতো না, মন খারাপ, মুখ ভার করে থাকত। একসঙ্গে খেলা করা, একসাথে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটা, একসাথে খেলাধুলো করা—সবই ওরা একসাথেই করত। কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয়, আর ওদের যে কি হয়ে গেল কেউ তা জানে না। হঠাৎ দুজনই দুজনের ঘোর শত্রু হয়ে উঠল এবং কথাবার্তা একদম বন্ধ হয়ে গেল।

চারক্রোশ দূরে কালীনগরী নামে একটি জায়গা ছিল। সেখানে মাকালীর সামনে পাঁঠা বলি হত। বলি দেখতে শ্রীপতি ও ভূপতি যেত। ফেরার সময় ভূপতি শ্রীপতিকে মেরে ফেলার জন্য পরিকল্পনা করত আর শ্রীপতি ভূপতিকে। খুব গোপনে কে কিভাবে কি করবে তা ঠিক করে নিয়েছিল। ওদের ফেরার পথে একটি বটগাছ পড়ত। শ্রীপতি ঐ গাছের

সুকুমার চক্রবর্তী

কাছে যখন আসবে তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে যাবে। সেই সময়ে ওকে মেরে ফেলার জন্য কিছু লোক নিযুক্ত করা হল। এদিকে আবার ভূপতিকে মেরে ফেলার জন্য গোপনে শ্রীপতি টাকা দিয়ে কিছু লোককে লাগিয়েছিল।

সেবারে বলির উৎসব উপলক্ষ্যে অনেক ভীড় জমেছিল। বহু লোকের সঙ্গে একজন যাদুকরও সেখানে এসেছিল। সে লোককে ডেকে ডেকে বলল, "আসুন আসুন। এর ভেতরে ঢুকলে একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে যাবেন। বুড়োরা ঢুকবে আর খোকা হয়ে যাবে।"

লোকে দেখতে পেল ভেতর থেকে যারা বেরিয়ে আসছে তারা প্রাণভরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে।

ভেতরে যে কি আছে জানার জন্য কৌতুহলী হয়ে শ্রীপতি সস্ত্রীক ভেতরে ঢুকল। ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই তার বয়স কমে একেবারে দশবছর হয়ে গেল। তার বউ একেবারে ছবছরের মেয়ে হয়ে গেল। আর বাচ্চাদের দেখা গেল না।

হঠাৎ এই ধরনের পরিবর্তনে ওরা

অবাক হয়ে গেল। শেষে ওর ভেতরে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলো করতে লাগল। শুধু যে শ্রীপতি ঢুকেছিল এবং তারও ঐ একই অবস্থা হল। দুজনেরই বয়স কমে যাওয়ায় ওরা অতীতের অনেক কিছু ভাবতে লাগল।

যাদুকরের ঘেরা-ঘরের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে যে যেমন ছিল সে তেমন হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্যজনক-ভাবে তাদের মনের কিছুটা পরিবর্তন হল। তাদের আগেই তাদের গিন্নীরা বাইরে এসে অপেক্ষা করছিল।

যাদুকরের ডেরার ভিতর কিছুক্ষণ থাকার ফলে তাদের মনে যে পরিবর্তন এসেছিল তাতেই তারা পরস্পরকে মেরে ফেলার যে চক্রান্ত করেছিল তা যেন ভুলে গেল। ফেরার সময় শ্রীপতি এবং ভূপতি তাদের ভাড়া করা গুণ্ডাদের আর কাজে লাগালো না। কেউ কাউকে হত্যা করার কথা চিন্তা করল না। সারা রাস্তা গল্পগুজব করতে করতে যে যার বাড়ি ফিরে এল।

পরের দিন শ্রীপতি এবং ভূপতির মধ্যে যখন দেখাসাক্ষাৎ হল তখন তারা আগের দিন কে কি করেছে, কেমন-ভাবে একে অন্যকে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছে তা বলে ফেলল। ব্যাপারটা তখন তাদের কাছে অত্যন্ত হাস্যকর লাগল। পূর্ব পরিকল্পিত কাজের জন্য তারা বার বার অনুতপ্ত হতে লাগল।

তারপর তাদের বন্ধুত্বের মধ্যে আর কোনদিন চিড় ধরেনি। আজীবন তারা বন্ধু হয়েই রইল।

অচল টাকা

নারান সাহা ভীষণ গজগজ করতে লাগল। কে জানি অচল টাকা দিয়ে গুড় নিয়ে গেছে। তাড়াহুড়োর মধ্যে নারান টাকাটা যে অচল তা লক্ষ্য করেনি।

পরে যখন লক্ষ্য করল তখন দেখল যে টাকাটা অচল। দোকানের সামনেই একটা ভিখিরী নুয়ে কি যেন একটা চকচকে জিনিস তুলে পকেটে রাখল।

চকচকে জিনিস দেখেই নারান সাহা চিৎকার করে ভিখিরীকে বলল, "ওটা আমার।"

ভিখিরী বলল, "ধর্মদাতা, আপনি কেন মিথ্যা কথা বলছেন?"

তারপর দর কষাকষি করে আট আনার পরিবর্তে ভিখিরীর কাছে টাকাটা নিয়ে তবে নারান ভিখিরীকে ছাড়ল। তবে আট আনা পয়সা হাতে নিয়ে ভিখিরীটা অন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকা বের করে নারানকে দিয়ে চলে গেল। এমন সময় নারানের বউ দোকানের সামনে কি যেন খুঁজছিল। পরে জানতে পারল ছেলে নাকি একটা টাকা ওখানে ফেলে গেছে।

তখন নারানের টনক নড়ল। তা হলে আট আনা দিয়ে ভিখিরীর কাছে যে টাকাটা নিয়েছে সেই টাকাটাই কি তার ছেলের টাকা! তারপর দেখে সেই টাকাটাও অচল। ছ ছটো অচল টাকা নিয়ে নারান সাহা মনে মনে কপাল চাপড়াতে লাগল।

তিল

ভুবন ও বীনা নামে এক দম্পতি ছিল। অনেক বছর পরে ওদের একটি ছেলে হল। তার একটি তিল ছিল কপালে। ভুবন তার বউ বীনাকে বলল, "দেখেছ, আমাদের ছেলের কপালে তিল আছে। এ ছেলে রাজা না হয়ে যায় না।" কিন্তু তার কথা বীনা মানতে রাজী হল না। তার মতে এই ধরনের তিল যাদের থাকে তারা পণ্ডিত হয়। দুজনের মধ্যে ভীষণ তর্ক শুরু হয়ে গেল। কেউ কারও কথা মানতে রাজী নয়। যে যার মতে অটল ছিল। এমন সময় ওদের বাড়ির সামনে একটি ভিখিরী এসে "ভিক্ষে দাও মা" বলে চিৎকার করতে লাগল।

প্রায় একই সঙ্গে ভুবন ও বীনা ঐ ভিখিরীর [illegible]লে তিল দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ তাদের মুখে রা ছিল না।
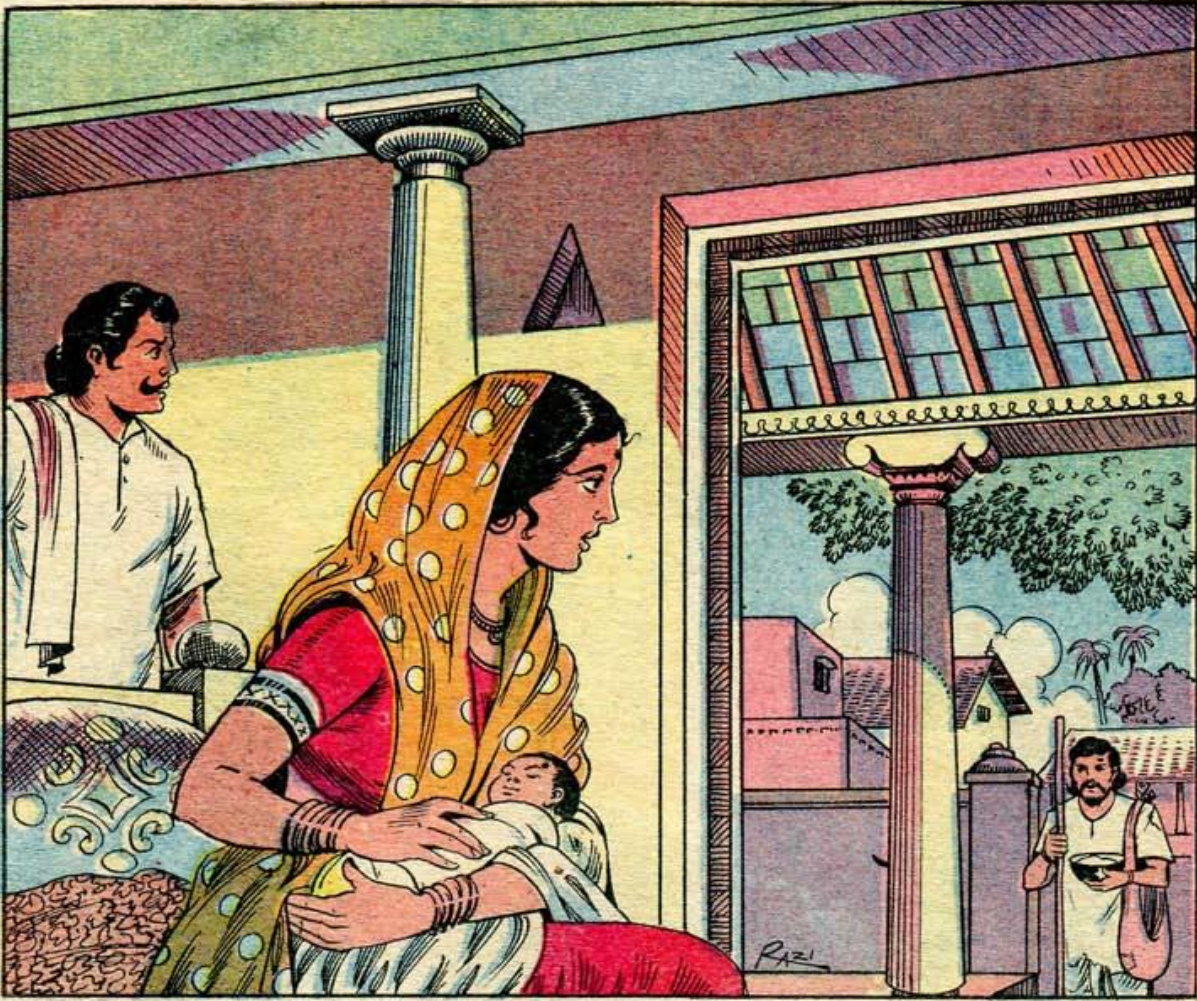
সমুদ্র মন্থন

দেবতা ও দানবের যুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরে হল। দেবতারা বুঝেছিলেন যে একমাত্র অমৃত পান করেই দীর্ঘদিন বাঁচা যাবে। তাই তাঁরা অমৃতের সন্ধানে মেরু পর্বত অঞ্চলে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন।

কিন্তু যতই খোঁজা হোক না কেন তাঁরা অমৃতের সন্ধান পেলেন না। শেষে ব্রহ্মা তাঁদের জানালেন যে সমুদ্র মন্থন না করলে অমৃত পাওয়া যাবে না। আবার দানবদের সাহায্য ছাড়া সমুদ্র মন্থন সম্ভবও নয়।
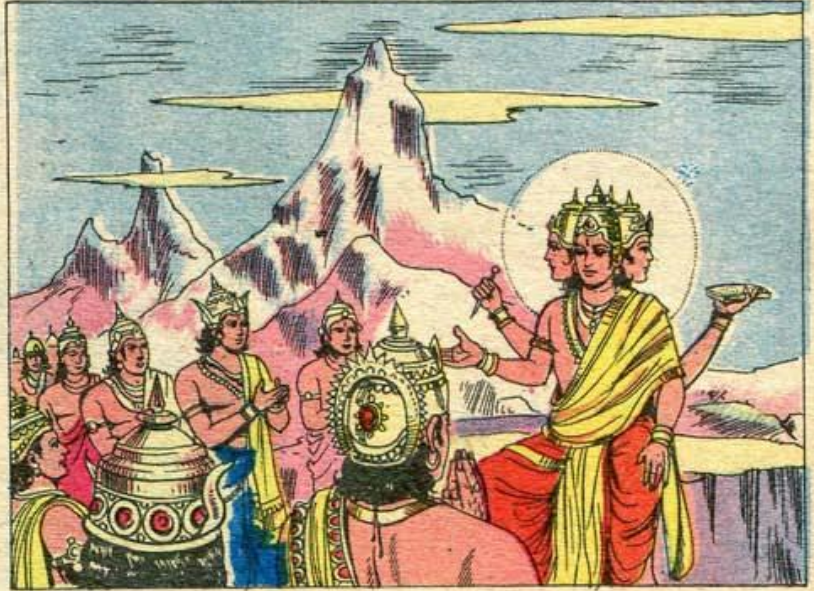
অমৃতের সন্ধান করতে দেবতাদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল দানবরা। মন্থনদণ্ড হিসাবে মন্দর পর্বতকে ব্যবহার করা হবে ঠিক হল। দণ্ডের সঙ্গে বাঁধা দড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হতে রাজী হল নাগরাজ বাসুকী।

বিষ্ণু কূর্ম অবতার ধারণ করে কচ্ছপের রূপ ধরে ঐ পর্বতকে ওপরে তুললেন। দানবেরা ধরল বাসুকীর মাথার দিকটা আর দেবতারা রইল তার লেজের দিকে। এইভাবে টানা এক যুগ ধরে অবিরাম গতিতে মন্থনের কাজ চলল।

যথাসময়ে বাসুকীর মুখ থেকে হলাহল বেরিয়ে আসায় জগৎসংসার ধ্বংস হতে চলল। তখন দেবতারা এর বিহিত করার জন্য শিবকে অনুরোধ করলেন। অগত্যা শিব ঐ বিষ নিজের কণ্ঠে ধারণ করলেন। এর জন্যই শিবের অন্য নাম নীলকণ্ঠ।
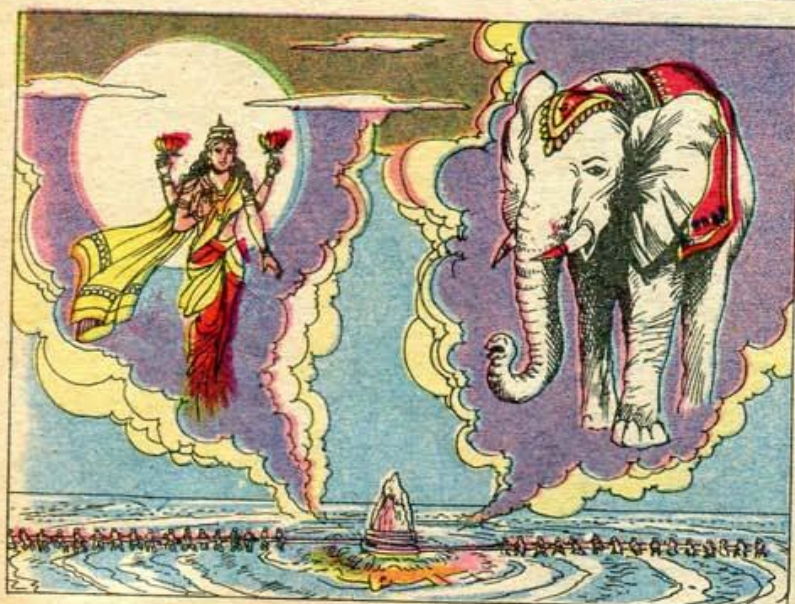
তারপর সমুদ্র থেকে অনেক কিছু উত্থিত হল। চন্দ্র, লক্ষ্মী, ঐরাবত নামে শ্বেতহস্তী প্রভৃতি। তখনও পুরোদমে চলছিল দেবতা ও দানবদের সমুদ্র মন্থনের কাজ।

এইভাবে মন্থন চলতে চলতে ধন্বন্তরীও জেগে উঠল সমুদ্র থেকে। পরবর্তী কালে ধন্বন্তরী হল দেবতাদের বৈদ্য। সমুদ্রমন্থনের ফলে কাজের কাজ হল।
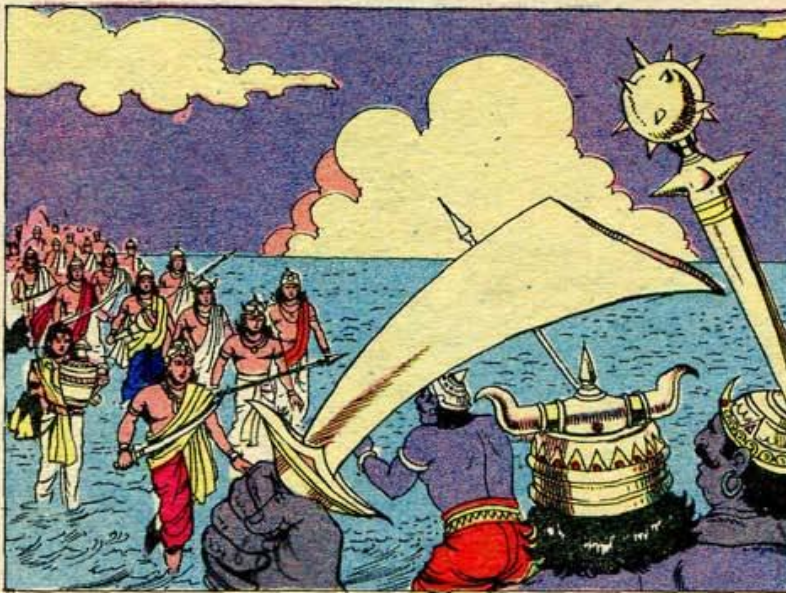
অমৃত পাওয়ার পর দেবতা ও দানবদের সংঘর্ষ নতুন করে দেখা দিল। অমৃত পাওয়ার জন্য দেবতা ও দানবদের সংঘর্ষ নীরব দর্শকের মত দাঁড়িয়ে দেখতে বাধ্য হল ধন্বন্তরী।

দেবতা ও দানবদের সংঘর্ষ যখন চরমে উঠেছিল তখন আবির্ভাব ঘটল এক অপরূপা সুন্দরীর। সে দেবতা ও দানবদের মধ্যে অমৃত বণ্টন করতে চাইল। তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে দানবেরা তার প্রস্তাবে রাজী হল।

সুন্দরীর রূপ ধরে এসেছিলেন বিষ্ণু। তিনি জানতেন যে দানবেরা যদি অমৃত পান করে তাহলে তারা অমরত্ব লাভ করবে। তখন অমর হয়ে তারা তিনটি লোকের অশান্তির সৃষ্টি করবে।

রাহু নামে এক দানব ছিল। সে দেবতার ছদ্মবেশে এসে ঐ সুন্দরী রমণীর কাছ থেকে অমৃত নিয়ে পান করল। সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে, বিষ্ণু ঐ অমৃত গলা থেকে নামার আগেই তার সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করে রাহুর গলা তৎক্ষণাৎ কেটে দিলেন।

দানবরা যখন টের পেল যে ঐ সুন্দরী রমনী আসলে ছলনাময়ী তখন কিন্তু সমস্ত অমৃত বন্টিত হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত অমৃত দেবতারা পান করে নিয়েছিলেন। অমরত্ব প্রাপ্তির পর দেবতারা দানবদের বিনাশ করলেন।
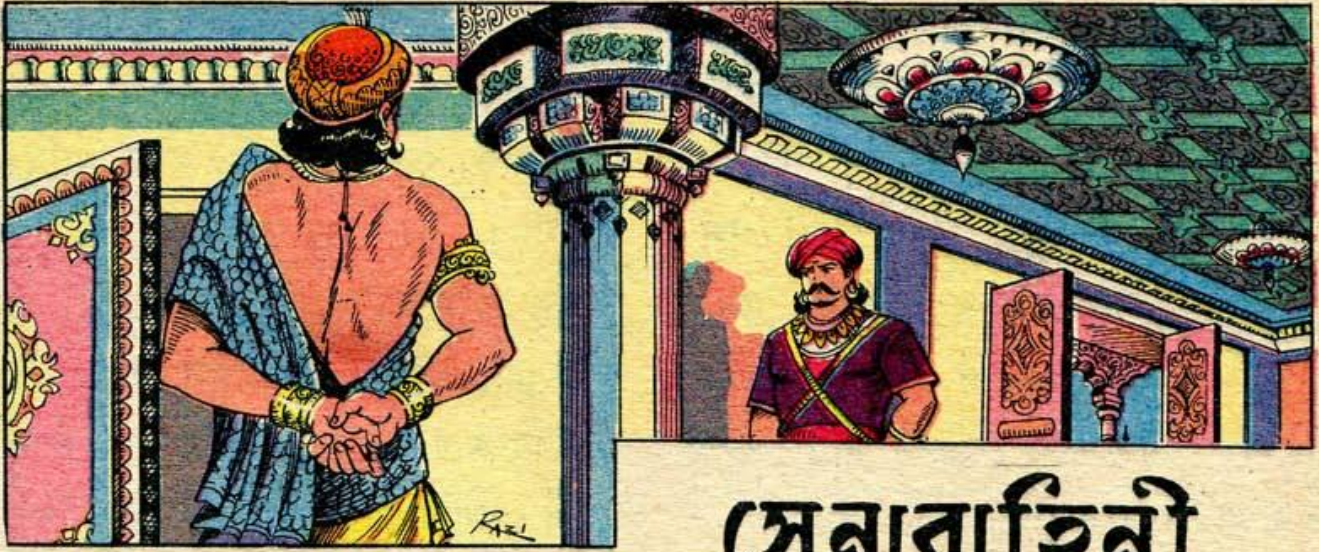
সেনাবাহিনী

কোশলদেশে ধর্ম, ন্যায় প্রভৃতি ছিল। কেউ মিথ্যা কথা বলত না, অন্যের জিনিস না বলে নিত না। এহেন দেশে হঠাৎ চুরি ডাকাতি শুরু হয়ে গেল। কোনদিন যা ছিল না তা হঠাৎ শুরু হওয়ায় রাজা সেনাবাহিনীর লোক নিয়োগ করলেন চোর ধরার কাজে।

কিছুদিনের মধ্যেই চুরি ডাকাতি কমে গেল। বছর দুয়েক সারা দেশে চুরি ডাকাতি হয়নি। কিন্তু তারপর আবার ব্যাপকভাবে চুরি ডাকাতি শুরু হয়ে গেল। যথারীতি চোর ধরার কাজে আবার সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হল। কিন্তু এবারে কেউ ধরা পড়ল না, চুরি ডাকাতিও বন্ধ হল না।

আগের বারে বন্ধ হওয়ায় এবং এবারে চুরি-ডাকাতি বন্ধ না হওয়ায় প্রজারা সেনাবাহিনীর লোককে সন্দেহ করতে লাগল। তাদের ধারণা হল নিশ্চয় চোর ডাকাত ধরার ব্যাপারে সেনারা উঠে পড়ে লাগছে না। তারা চোর ডাকাতদের কাছে ঘুষ খাচ্ছে।

সেনাবাহিনীর নামে এই অপবাদে রুষ্ট হল সেনানায়ক। সে রাজার কাছে প্রজাদের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। রাজা সেনানায়ককে বললেন, "দেখ, চোর ডাকাত ধরার জন্যে সেনাবাহিনীকে নীয়োগ করা হল। তারা যদি না ধরে তাহলে বুঝতে হবে হয় সেনাবাহিনী

সর্বাণী কর

চোর ধরতে অক্ষম অথবা ঘুষ খাচ্ছে। অতএব প্রজাদের অন্যায় দেখছি না।"

রাজার মুখে এই ধরনের কথা শুনে সেনাপতি মনে মনে ভীষণ রেগে গেল। সেনাবাহিনীর লোকও বলাবলি করল, "এবার আমরা ধর্মঘট করব। আমরা কেউ ঘর থেকে বেরবো না। দেখি, রাজা কিভাবে রাজ্য শাসন করে।"

সেনাবাহিনীর এই কথা শুনে রাজা রীতিমত ভয় পেলেন। চুরিডাকাতি বেড়ে যাবে ভেবে প্রজারা ঘাবড়ে গেল।

সারা দেশে অচল অবস্থার সৃষ্টি হল। একমাস কেটে গেল। কিন্তু সেনাবাহিনীর লোক ঘর থেকে বেরুল না। দীর্ঘ একমাস পরে কয়েকজন প্রজা রাজার সঙ্গে দেখা করে বলল, "মহারাজ, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন গত এক মাসে, কোন চুরি হয়নি।"

প্রজাদের এই কথা শুনে অবাক হয়ে রাজা বললেন, "চুরির খবর আমিও পাইনি। তবে এর কারণ যে কি তাও আমি জানিনা।"

চুরিডাকাতি যে কেন হলনা তা জানার জন্য তদন্ত করতে করতে জানা গেল সেনাবাহিনীর লোকের মধ্যে কিছু চোর ডাকাত আছে। সঠিকভাবে এটা জানতে পেরে রাজা সেনানায়ককে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

আসল ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ায় সেনানায়ক লজ্জা পেল। বাহিনীর অনেকেই রাজার কাছে ক্ষমা চাইল।

তারপর থেকে রাজা সেনাবাহিনীর লোকের কাজকর্মের ওপরেও নজর রাখার জন্য লোক নিয়োগ করলেন।
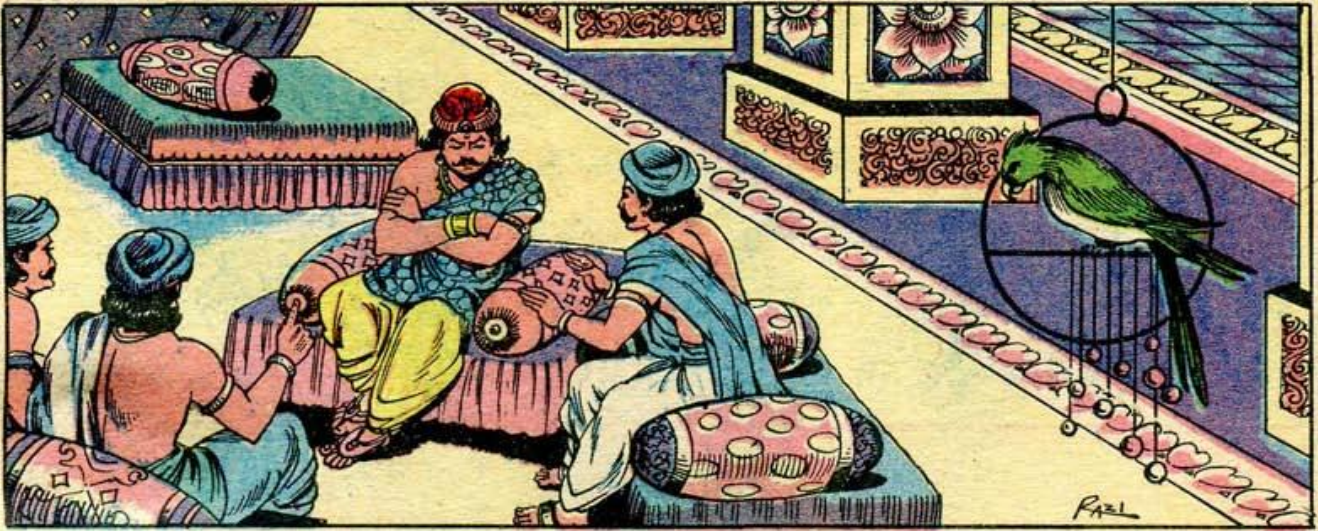
ঘোড়া দেখলে

সুনন্দকর নামে এক বৈদ্য ছিল। সে জমিদারের বাড়ির পাশে ঘর ভাড়া করে রুগী দেখত। কিছুদিনের মধ্যেই সুনন্দকর ও জমিদারের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠল। বৈদ্যের সঙ্গে সম্পর্ক গভীরতর হওয়ার পর থেকে যখন তখন জমিদারের শরীর খারাপ হয়ে যেত।

একদিন জমিদার বলল, "সুনন্দ, আমার প্রায়ই শরীর খারাপ হয়। কেন বল তো?"

জবাবে অন্য প্রসঙ্গ তুলে পরেরদিন সাতসকালে সুনন্দকর বাড়ি চলে গেল। যাওয়ার আগে জমিদারকে বলল, "তেমন যদি বাড়াবাড়ি হয় আমার বাড়িতে লোক পাঠাবেন। আমি চলে আসব।"

অনেক দিন কেটে গেল। সুনন্দকর জমিদারবাড়ির কোন খবর পেল না। শেষে জমিদারের কাছে এসে বলল, "কি ব্যাপার! এতদিনে কোন খবর পেলাম না তো?"

"খবর দেওয়ার মত কিছু ছিল না যে!" জমিদার বলল।

"এই হয়। ঐ যে প্রবাদ আছে, ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হয়।" সুনন্দকর বলল।
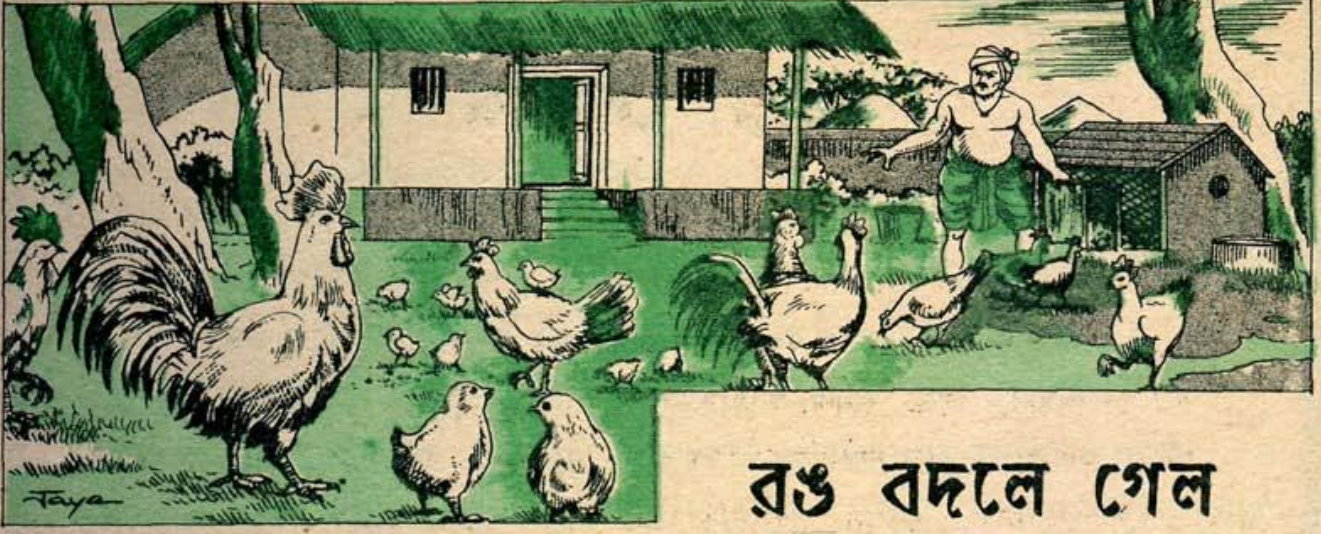
রঙ বদলে গেল

এক ছিল বুড়ি। তার ছিল সাদা মোরগ। সে মোরগটিকে অত্যন্ত যত্নে পুষছিল। পাড়ার অন্য লোকও মোরগটিকে দেখে আনন্দ পেত।

একদিন রাত হয়ে গেল। কিন্তু মোরগটি ফিরল না। বুড়ি উদ্বিগ্ন হয়ে এর বাড়ি ওর বাড়ি খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। কিন্তু কেউ মোরগের হদিশ দিতে পারল না। রাত্রে বুড়ি পেটভরে খেলও না। মন খারাপ করে বুড়ি ঘুমিয়ে পড়ল।

আসল ঘটনা ছিল অন্যরকম। অনেক দূরে মোরগটা চলে গিয়েছিল। সেখানে আরও অনেক মোরগ মুরগী ছিল। সেখানে ওদের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে হঠাৎ অন্ধকার পড়তেই সেখানে থেকে যেতে বাধ্য হল। অতগুলো মুরগীর মালিক ছিল রসরাজ। মোরগ মুরগীগুলোকে রাত্রে গুণে দেখতে গিয়ে দেখে তার মধ্যে একটা নতুন সাদা মোরগ আছে। রসরাজ কি ভেবে ঐ সাদার উপর হলুদ রঙ লাগিয়ে দিল।

ভোর হতেই রসরাজ মোরগের খোপের দরজা খুলে দিল। তৎক্ষণাৎ মোরগ পালিয়ে গেল।

কিন্তু মোরগটি বুড়ির বাড়িতে আসার আগেই ধরা পড়ল অশোক নামে পুতুল তৈরির এক কারিগরের হাতে। হলুদ রঙের অতবড় একটি মোরগকে দেখে অশোকের ভীষণ লোভ

হল। সে তাড়াতাড়ি ঐ মোরগের গায়ে সাদা রঙ লাগিয়ে দিল। উদ্দেশ্য, যার মোরগ সে যাতে চিনতে না পারে। সাদা রঙ লাগিয়ে অশোক মোরগটাকে বাড়ির সামনে বেঁধে রাখল।

সকালে খোঁজ করতে করতে বুড়ি অশোকের বাড়ির সামনে এসে চেঁচামেচি করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে লোক জুটে গেল। সাদা রঙের মোরগটা যে বুড়ির তা সবাই একবাক্যে স্বীকার করল। কিন্তু অশোক কিছুতেই তাদের এই কথা মানতে রাজী হল না।

শেষ পর্যন্ত বিষয়টা বিচারকের কাছে গেল। সাদা মোরগটা যে বুড়ির এই বিষয়ে পাড়ার সবাই এসে বুড়ির পক্ষে সাক্ষী দিল।

বিচারকের জেরার চাপে হঠাৎ একসময় অশোক বলল, "এই মোরগটা যদি সাদা না হয়ে হলুদ রঙের হয় তাহলেও কি এটা বুড়ির হবে? আসলে এই মোরগটা কিন্তু হলুদ রঙের। হলুদ রঙের উপর আমি সাদা রঙ লাগিয়েছি। ওটা আমার পছন্দ।"
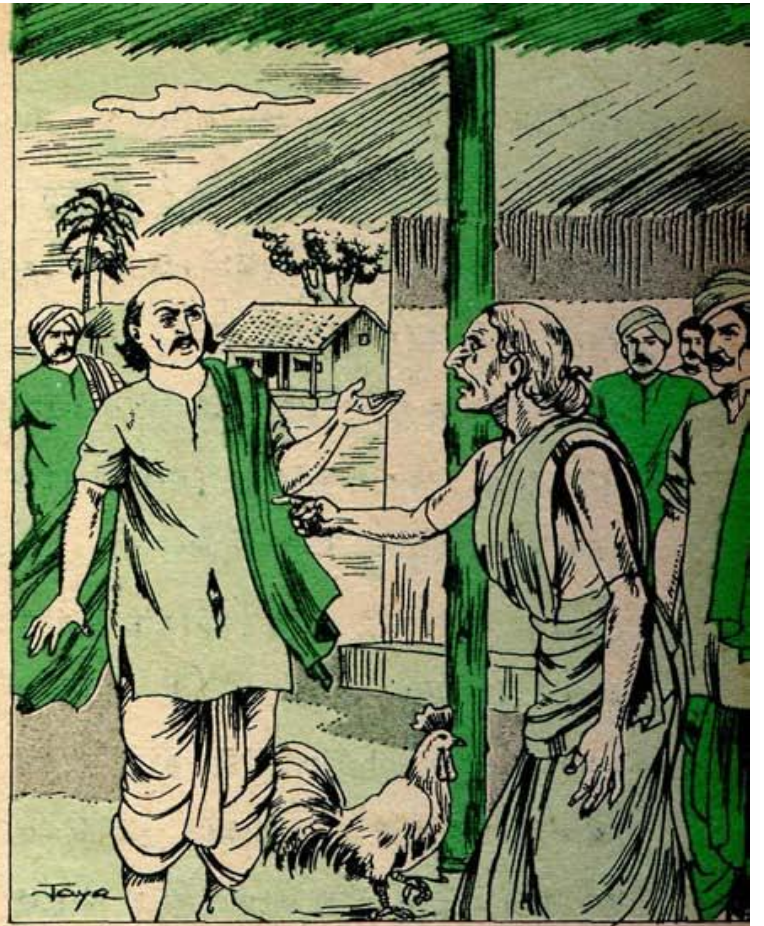
সঙ্গে সঙ্গে রসরাজ চিৎকার করে বলে উঠল, "ওটা যদি হলুদ রঙের মোরগ হয়, তাহলে কিন্তু ওটা আমার। সেই ভোর থেকে ওটাকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"হলুদ রঙের মোরগের গায়ে সাদা রঙ লাগিয়ে চুরি করার অপরাধে তোমার পঁচিশ টাকা জরিমানা হল।" বিচারক বলল।

বিচার হয়ে গেল কিন্তু বুড়ি ছাড়বার পাত্রী নয়। মোরগের চাল-চলন, ডাক ইত্যাদি দেখে শুনে বুড়ি

নিশ্চিত হল, এটা তারই মোরগ। তার কান্না এবং চিৎকার শুনে বিচারকের আবার সন্দেহ হল। মোরগটাকে জল দিয়ে ভাল করে ধোওয়া হল। একবার ধোয়ার ফলে সাদা রঙ উঠে গিয়ে হলুদ রঙ দেখা গেল আবার ধোয়ার ফলে সেই হলুদ রঙটা উঠে সাদা রঙ দেখা গেল। সাদা রঙ দেখে বিচারক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার রসরাজ, তুমি যে বলেছিলে, হলুদ রঙের মোরগ তোমার? তোমার মোরগের রঙ জল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাচ্ছে কেন বলত?"

জবাবে রসরাজ আমতা আমতা করে বলল, "আজ্ঞে কেনার সময় ওটা ঐরকমই ছিল।"

তারপর বিচারকের অন্য প্রশ্ন শুনে রসরাজ আর জবাব দিতে না পেরে তৎক্ষণাৎ বিচারকের পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল।

কিন্তু বিষয়টা ক্ষমার নয়। তাই রসরাজের পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হল। রসরাজ এবং অশোক বুড়ির হাতে টাকা দিয়ে তার কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইল।

বুড়ি টাকা ফেরত দিয়ে বিচারককে বলল, "আমার মোরগ আমি ফিরে পেয়েছি এতেই আমি খুশী। আমি অন্যের খাটনির পয়সা চাইনা।"

বিচারক বলল, "বুড়ির কথা শুনেছ? এখনও কি তোমাদের মনে শুভবুদ্ধি জাগবে?"

বুড়ি মহানন্দে নিজের সাদা মোরগটিকে নিয়ে বাড়ি ফিরল।
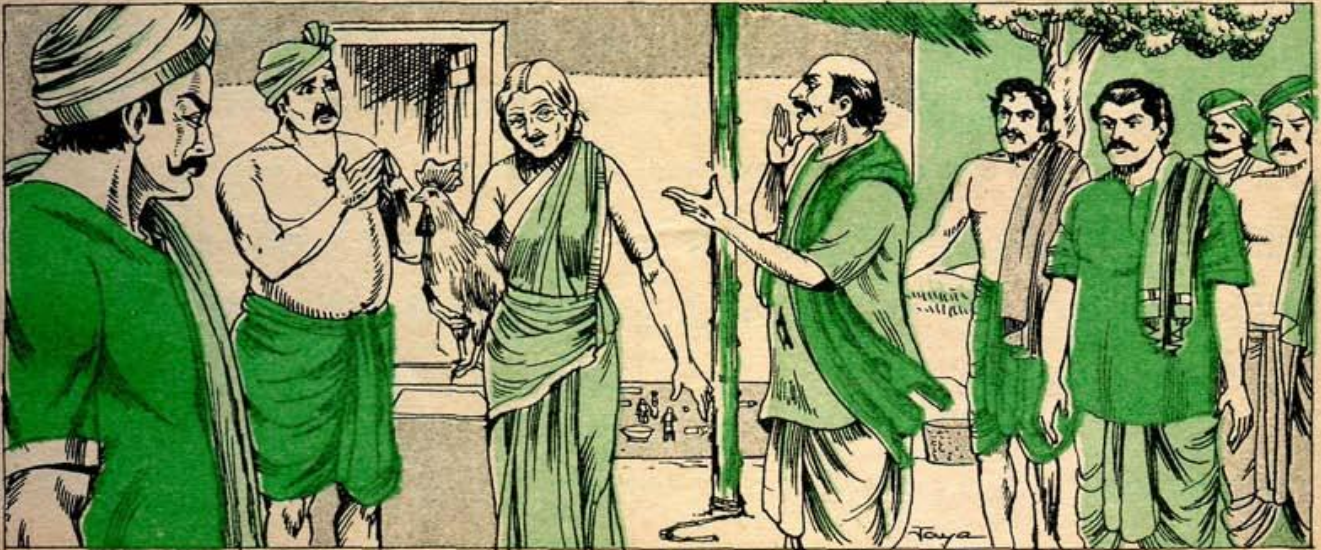
পচা পচাই

গ্রামের নাম মালঞ্চ। ঐ গ্রামে পচা জ্যোতিষী নামে এক জ্যোতিষী ছিল। সাতগাঁয়ের লোক পচাকে চিনত।

হঠাৎ একদিন পচার মনে হল বাবা-মা আমার নাম কি একটা রেখেছে! কি না পচা।

সেদিন সারারাত ভেবে সে ঠিক করল নিজের নাম বদলে শংকর রাখবে। যে আসবে তাকেই বলে দেবে এই নাম।

যথারীতি লোক এল। "পচা জ্যোতিষীমশাই" বলে ডেকে আসতেই সে তাকে বলল, "দেখুন, আমাকে শংকর জ্যোতিষী নামেই ডাকবেন।"

এইভাবে মুখে মুখে প্রচার করলেও মালঞ্চগ্রামের লোক কিন্তু তাকে যাথারীতি পচা জ্যোতিষী নামেই ডাকত। বুড়োরা তাকে বলল, "বাবা তুমি এখন বড় হয়েছ। তোমার কত নামডাক। তবে বাবা তোমাকে যে নামে ডেকে আসছি সেই নামেই ডাকব।"

পচা জ্যোতিষী দিনরাত ভেবে সপরিবারে দূরের এক গ্রামে চলে গেল।

একদিন সকালে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে একটা কাঠবিক্রেতা এল। জ্যোতিষীর বউ ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, "কাঠগুলো ভেজা হবে না?"

কাঠবিক্রেতা বলল, "কি বলছেন মা! আপনি এ গাঁয়ে নতুন এসেছেন, তাই। শংকরের কাঠ বললে সাত

নকুল রায়

গাঁয়ের লোক চেনে। আমার কাঠ যদি না জ্বলে তাহলে শিবের তৃতীয় চোখ দিয়েও আগুন ঝরবে না। মনে রাখবেন আমার নাম শংকর কাঠুরে।"

কাঠ বিক্রেতার কথা কানে যেতেই জ্যোতিষী চমকে উঠল। মনে মনে ভাবল, একটা কাঠ বিক্রেতার নাম শংকর। না আর শংকর নাম রাখা যাবে না।"

তারপর দু-একদিন ভেবে সে নিজের নাম রাখল লক্ষ্মীপ্রতিম। কিন্তু ঐ গাঁয়ের লোক ছিল শৈব। শংকর নাম তাদের পছন্দ। তারা শংকরকে লক্ষ্মীপ্রতিম নামে ডাকতে রাজী হল না। তাদের মতে, লক্ষ্মীকে ডাকা মানে বিষ্ণুকে স্মরণ করা। শৈব হয়ে আর যাই হোক বিষ্ণুকে স্মরণ করবে না। তাদের যুক্তি শুনে বিরক্ত হয়ে জ্যোতিষী অন্য গ্রামে চলে গেল।

নতুন গ্রামে নতুন নামে পরিচিত হল। এখানে কেউ তাকে পচা জ্যোতিষী বা শংকর জ্যোতিষী নামে ডাকল না। ডাকল নতুন নামে। লক্ষ্মীপ্রতিম জ্যোতিষী নামে সে পরিচিত হল।

একদিন সকালে একটা ভিখিরী হেঁকে বলল, "মা, মাগো, লক্ষ্মীপ্রতিম এসেছে, ভিক্ষে দাও মা।"

জ্যোতিষী চমকে উঠল। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না। ভাবল, "আমার নাম আর ভিখিরীর নাম এক। না, এই নাম আর রাখা যাবে না। এবার থেকে আমি নিজের নাম রাখব চিরঞ্জীব।"

পরের দিন থেকে সবাইকে নিজের নাম চিরঞ্জীব বলে জানাল। কিন্তু ঐ

গ্রামের লোক ছিল বৈষ্ণব। ওরা লক্ষ্মীপ্রতিম নামেই ডাকতে চাইল। ওদের এই মনোভাব লক্ষ্য করে জ্যোতিষী অন্য গ্রামে গেল।

নতুন গ্রামে চিরঞ্জীব নামে পরিচিত হল পচা জ্যোতিষী। কয়েকদিন পরে পচা জ্যোতিষীর কাজের লোক অনেক দেরিতে এল। জ্যোতিষী জিজ্ঞেস করল, "কি হল এত দেরি হল কেন?"

"আর বলবেন না বাবু। বাড়ির সামনের তিন বছরের ছেলে সাত সকালে মারা গেছে। বাবা-মা কত আশা করে তার নাম রেখেছিল চিরঞ্জীব। আর সেই ছেলে কিনা মারা গেল তিনবছর ঘুরতে না ঘুরতেই। বলুন তো বাবু নামের কি কোন দাম আছে?" কাজের লোক বলল।

তার কথা শুনে জ্যোতিষীর মাথা ঘুরতে লাগল। এই চিরঞ্জীব নামেও পরিচিত হতে তার ইচ্ছা করল না। ভাবল, "মালঞ্চ গ্রামে পচা জ্যোতিষী নামে আমার কত নামডাক ছিল। নাম বদলাতে গিয়ে আমার নামও গেল খ্যাতিও গেল।" এই কথা ভাবতে ভাবতে সে দু-চারদিন পরে পচা জ্যোতিষী হয়েই ফিরে এল নিজের গ্রামে।

শুধু নামের জন্য হঠাৎ ওভাবে চলে যাওয়াতে গ্রামের অনেকেই দুঃখ পেল। ওরা এসে বলল, "আপনি চলে গেলেন কেন? আমরা এবার থেকে শংকর জ্যোতিষী নামেই ডাকব।"

"না অন্য নামে নয়। পচা জ্যোতিষী নামেই ডাকুন।" সে বলল।

ভূত পালিয়ে গেল

বাণী ও বরুণ স্বামী স্ত্রী। এই দম্পতির প্রতি অনেকের ভালবাসা ছিল। ওদের ব্যবহারের গুণেই ওরা সকলের ভালবাসা পেয়েছিল।

একদিন রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। সেই সময় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ওরা দরজা খুলে দেখে এক মহিলা ও পুরুষ জলে ভিজে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

ওরা দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল শহরে যাওয়ার পথে হঠাৎ আমরা বৃষ্টিতে আটকে পড়েছি। এত রাত্রে কোথায় যে যাব ভেবে পাচ্ছি না। শুধু এই রাত্রিটা যদি আমাদের একটু থাকতে দেন, বড় উপকার হয়।"

"ভেতরে আসুন।" বাণী ও বরুণ একসঙ্গে বলে উঠল। তারপর ওরা ভেতরে গেল। ওদের খাওয়া দাওয়ার পর শোওয়ার জায়গা করে দিল বাণী।

আলাপ পরিচয় সাধারণভাবে কিছুটা হলেও কেউ কারও ঠিকানা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাল না।

ভোররাত্রে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে বাণী ও বরুণ উঠে পড়ল। ওরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করল রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজে যে দম্পতি এসেছিল তাদের মধ্যে একজন আছে অন্যজন নেই। পুরুষ নেই, মহিলা আছে। মহিলা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, "আমার সংসার ভেঙে

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

গেল গো! ওগো আমার একি সর্বনাশ হল গো।" তারপর সে বাণী ও বরুণের দিকে তাকিয়ে বলল, "রাত্রে শোওয়ার সময় আমাকে ও বলল, "দেখ তো এই বাড়ির গিন্নী তার স্বামীকে কত ভালবাসে।" আমার কথা তুমি শোন। তুমি আমাকে এত ভালবাস।" এইধরনের অনেক কথা বলতে বলতে মহিলাটি কাঁদতে লাগল।

চন্দ্রাবতী বলল, "জানি সে আর ফিরবেনা। আমিও আর বাঁচব না। আমি এবার কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে মরব।"

তার অবস্থা দেখে বাণী ও বরুণের মন খারাপ হয়ে গেল। তারা ভাবল, এই অবস্থায় ছেড়ে দিলে চন্দ্রাবতী হয়ত আত্মহত্যা করবে। ওরা চন্দ্রাবতীকে বলল, "শোন চন্দ্রাবতী, যতদিন না তোমার কর্তা ফিরে আসছেন ততদিন তুমি এখানেই থাক। তোমার কোন অসুবিধা হবে না।"

তারপর থেকে চন্দ্রাবতী ওদের বাড়িতেই রয়ে গেল। তার বিনয় ও ভদ্র ব্যবহার দেখে বাণী ও বরুণ তার প্রতি আকৃষ্ট হল। দেখতে দেখতে
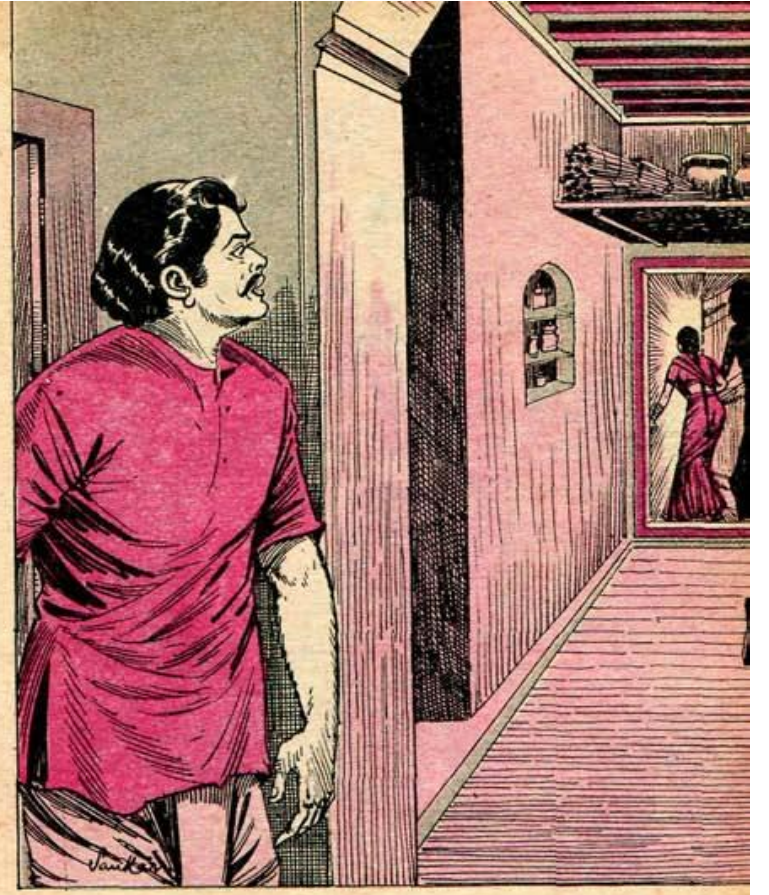
বাড়ির টুকটাক অনেক কাজ এমন কি রান্নাবাড়াও করতে লাগল। বাড়ির কোন্ জিনিসটা কোথায় আছে তাও আর চন্দ্রাবতীর অজানা ছিল না।

এইভাবে একমাস কেটে গেল। বরুণের এক বন্ধু ছিল। নাম মুরারী। চন্দ্রাবতীকে সে কোনদিন দেখেনি। তাই প্রশ্ন করে বরুণের কাছে সব জানতে পারল।

রাত্রে অনেকক্ষণ মুরারী গল্পগুজব করে কাটাল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। গভীর রাত্রে কিসের শব্দে মুরারীর ঘুম
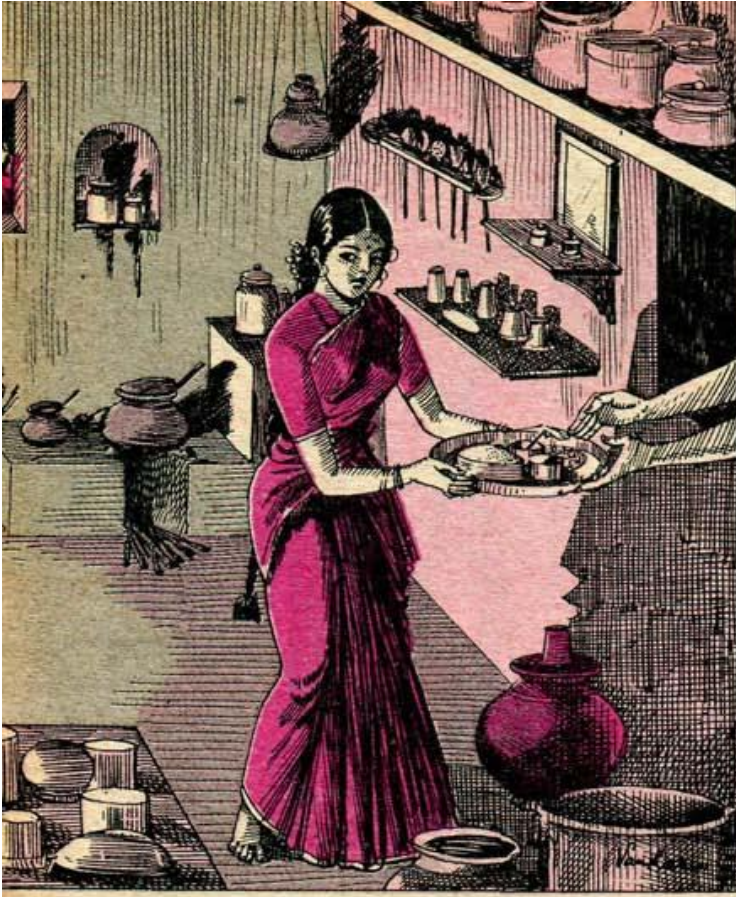
ভেঙে গেল। লক্ষ্য করল, চন্দ্রাবতী আলো নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে।

মুরারীর সন্দেহ হল। এত রাত্রে চন্দ্রাবতী রান্নাঘরে যাচ্ছে কেন? পা টিপে টিপে চন্দ্রাবতীকে সে অনুসরণ করল। আড়াল থেকে মুরারী লক্ষ্য করল, চন্দ্রাবতী ভাত ডাল তরকারি সব গুছিয়ে একটি পাত্রে রেখে রান্নাঘরের বাইরে কাউকে দিচ্ছে। ঠিক সেই সময় রান্নাঘরের ওপাশের লোকটা বলল, "আর কতদিন এখানে পড়ে থাকবে। সোনাদানা নিয়ে চলে এস।"

অন্ধকার থাকায় মুরারী লোকটাকে চিনতে পারল না। এদিক থেকে চন্দ্রাবতী বলল, "অত অস্থির হচ্ছ কেন। ওরা আমাকে ভালভাবে বিশ্বাস করুক তারপর সিন্দুকের চাবিটা নেব।"

"ওরে বিশ্বাসঘাতিনী, তোকে দেখে তো মনে হয় কত ভাল ভদ্র মহিলা। আর তোর পেটে এত বদমায়েসী বুদ্ধি। স্বামী স্ত্রীতে যুক্তি পরামর্শ করে আমার বন্ধুর সর্বনাশ করার জন্য এই বাড়িতে ঢুকেছ। দাঁড়াও তোমায় মজা দেখাচ্ছি।" এই কথাগুলো মুরারী মনে মনে বলল।

পরেরদিন চন্দ্রাবতীকে শুনিয়ে শুনিয়ে মুরারী বলল, "ওহে বরুণ, তোমার বাড়িতে ভূত আছে। কালকে রাত্রে লক্ষ্য করলাম সারারাত কি যেন ঘোরাফেরা করছে। নূপুরের ধ্বনি শুনেছি। আমি যেদিকে মাথা রেখেছিলাম সেদিকে মাথা নেই।

বাণী ও বরুণ মুরারীর কথা শুনে বলে উঠল, "তাহলে কি হবে? ওঝাকে ডাকব?"

"কোন দরকার নেই। কি করে

ভূত তাড়াতে হয় আমি তা খুব ভাল ভাবেই জানি।" মুরারী বলল।

তারপর সে গোপনে বাজারে গিয়ে একগোছা নূপুর কিনে আনল। রাত্রে সে নিজের বিছানায় বালিশ দিয়ে এমনভাবে সাজিয়ে চাদর ঢাকা দিল যাতে দূর থেকে মনে হবে মুরারী ঘুমোচ্ছে। নিজে সে ঐ নূপুর নিয়ে অন্ধকারে পা টিপে টিপে ঘুরঘুর করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। যথাসময়ে চন্দ্রাবতী ভাত ডাল তরকারি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। ঠিক সেই সময় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মুরারী সেই ভাতের থালা নিয়ে দ্রুত অন্য পথে চন্দ্রাবতীর ঘরে ঢুকে তার বিছানার উপর ভাতের থালাটি রেখে দিল।

অন্য দিনের মত সেদিনও চন্দ্রাবতী রান্নাঘর বন্ধ করে নিজের বিছানায় শুতে গিয়ে, বিছানার উপর ভাত দেখে "মাগো" বলে চিৎকার করে উঠল।

তার চিৎকার শুনে বাণী ও বরুণ চমকে উঠে চন্দ্রাবতীর ঘরে ঢুকল।
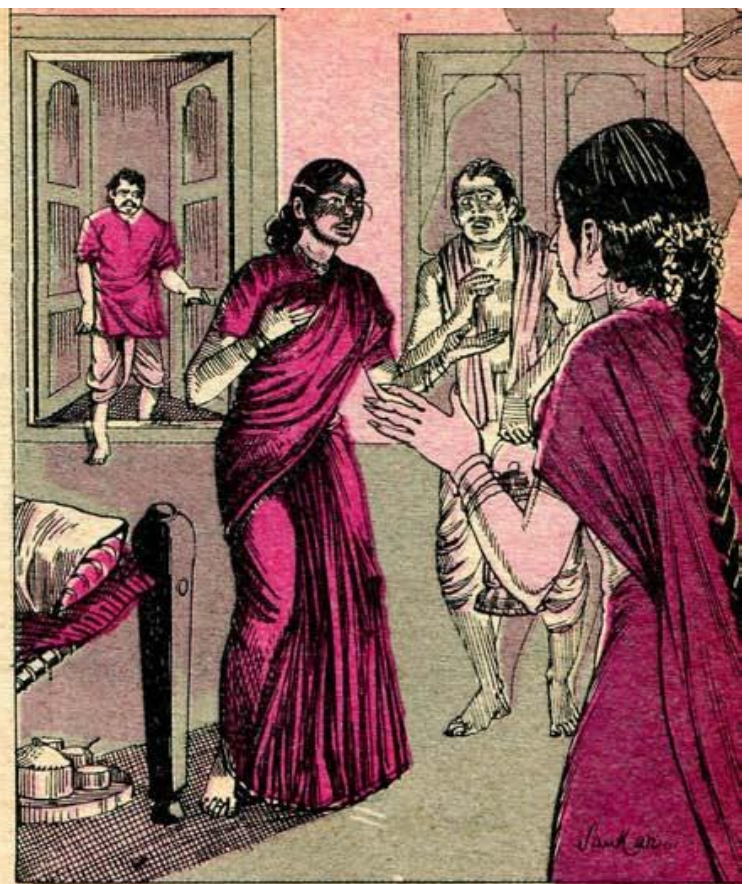
ঠিক তক্ষুণি ঘুম ভাঙার মত ভঙ্গী করে মুরারীও চন্দ্রাবতীর ঘরে এল।

চন্দ্রাবতী ভাঙা গলায় বলল, "ভূত! আমি নূপুরের ধ্বনি শুনেছি। আমার বিছানার ওপরে ভাতের থালা ছিল। রান্নাঘর থেকে থালা বাটি এগুলো এলো কি করে?"

"ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি যখন আছি ভূত তাড়াতে পারবই।" মুরারী বলল।

তারপর দুদিন নূপুরের ধ্বনি শোনা গেল। চন্দ্রাবতী রাত্রে আর উঠল

না। তার মনে ভূতের ভয় চেপে বসে রইল। তিনদিন পরে মধ্যরাত্রে মুরারী পা টিপে টিপে খিড়কির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে আপনমনে বলে যেতে লাগল, "আমার বোনের এতবড় সর্বনাশ করবে!" কাছেই চন্দ্রাবতীর স্বামী দাঁড়িয়েছিল। সে মুরারীকে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে?"

"আমার বোনের সর্বনাশ হয়েছে মশাই। কিছুদিন আগে একটা লোক এসে নিজের বউকে এই বাড়িতে রেখে গেছে। এটা আমার বোনের শ্বশুরবাড়ি। আমার জামাইবাবুর নাম বরুণ। খুব ভাল লোক ছিল। কিন্তু এখন খারাপ হয়ে গেছে। আমার বোনের ছেলেমেয়ে নেই। তাই সে নাকি চন্দ্রাবতীকে বিয়ে করে ফেলবে। তাই আমি ঠিক করেছি চন্দ্রাবতী বেরলেই আমি তাকে মেরে ফেলব।"

পরের দিন সাত সকালে চন্দ্রাবতীর স্বামী এসে তাকে নিয়ে গেল। টানা তিনদিন বরুণের বাড়িতে থেকে চন্দ্রাবতী ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

"চন্দ্রাবতী চলে যাওয়ার পর বাড়িটা যেন ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে।" বাণী ও বরুণ মুরারীকে বলল।

ওদের কথা শুনে মুরারী হো হো করে হেসে বলল, "ঠিক উল্টোটা হয়েছে। এই বাড়িতে ভূত ঢুকেছিল। চন্দ্রাবতী যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী থেকে ভূতটাও চলে গেছে।"

তারপর চন্দ্রাবতী যা যা করেছে তা সবিস্তারে জানিয়ে মুরারী সেইদিনই নিজের বাড়িতে ফিরে গেল।
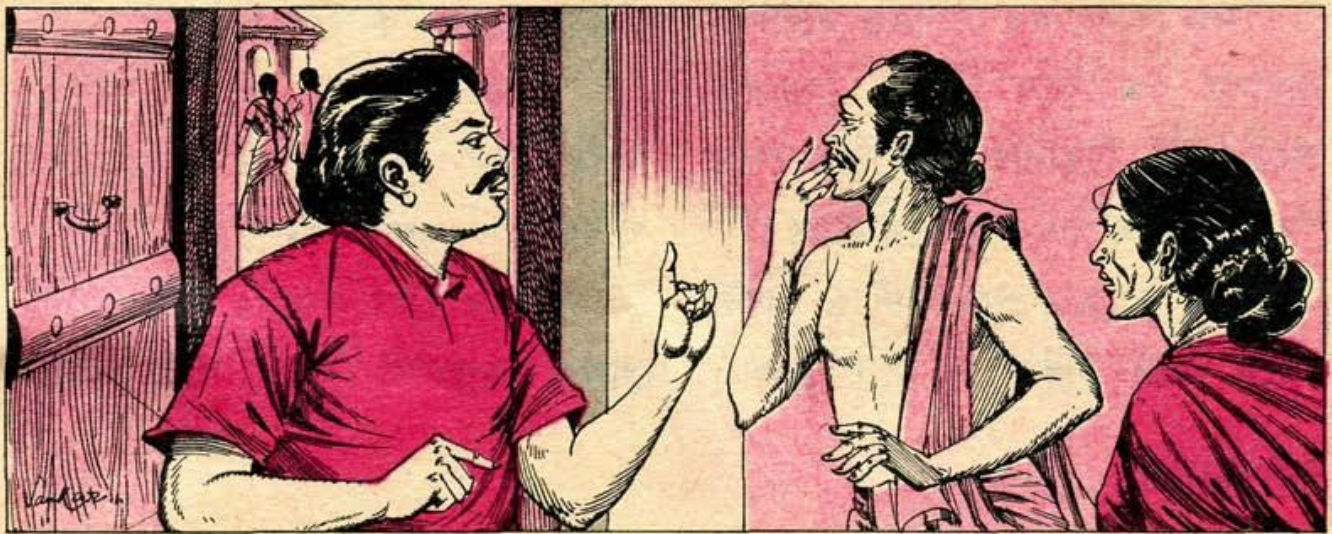
দেবী ভাগবত

দেবদূত ইন্দ্রের কাছে ফিরে গিয়ে চন্দ্র যা যা বলেছিল সব সবিস্তারে বলল।

"এহেন জঘন্য কাজ করেও চন্দ্র এইধরনের কথা বলল! ওর সাহস তো কম নয়।" এই কথা বলে ইন্দ্র চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা ভাবলেন। শুক্র নিজের দলবল নিয়ে চন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল। শিব বৃহস্পতিকে সাহায্য করার কথা দিলেন। উভয়পক্ষের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

তখন ব্রহ্মা এসে চন্দ্রকে বললেন, "তুমি বৃহস্পতির বউকে ছেড়ে দাও। তারপর ব্রহ্মা শুক্রকে বললেন, "জানি তোমার সঙ্গে বৃহস্পতির বনিবনা নেই। কিন্তু তাই বলে এই কাজকে যদি আস্কারা দেওয়া হয় তাহলে ভবিষ্যতে কোন স্ত্রী কি তার স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে পারবে?"

ব্রহ্মার কথা শুনে শুক্র চন্দ্রকে অনুরোধ করল তারাকে ছেড়ে দিতে। গর্ভবতী অবস্থায় চন্দ্র তারাকে বৃহস্পতির হাতে ছেড়ে দিল। বৃহস্পতির বাড়িতে আসার পর তারার একটি ছেলে হল। ঐ ছেলে ভূত-ভবিষ্যতের ঠিকুজী তৈরী করার সময় চন্দ্রের দূত এসে চন্দ্রের পক্ষ নিয়ে বৃহস্পতিকে বলল, "এ তো

৩. বুধের জন্ম

বললেন, "এই তোমার জন্যে দেখ তো কত গোলমাল শুরু হয়ে গেল। তুমি বলত এ ছেলে চন্দ্রের না বৃহস্পতির ?"

তারা ব্রহ্মার দিকে মুখ তুলে না তাকিয়ে সলজ্জ ভঙ্গীতে মাথা নিচু করে বলল, "চন্দ্রের। চন্দ্রের। চন্দ্রের।"

ব্রহ্মা সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে চন্দ্রের হাতে তুলে দিয়ে মীমাংসা করে ফেললেন। তারপর ঐ ছেলের নাম হল বুধ। বুধের ছেলে হল পুরূরব।

পুরূরবের কাহিনী

একবার রাজা সুদ্যুম্ন নিজের মন্ত্রীদের নিয়ে এক মনোহর অরণ্যে সদলবলে শিকার করতে বেরিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সুদ্যুম্ন এবং তার সঙ্গে যত লোক ছিল সবাই মেয়ে হয়ে গেল। এমন কি সুদ্যুম্নর ঘোড়াও মেয়ে ঘোড়া হয়ে গেল। সুদ্যুম্ন ভাবল, "আমি যে এইরকম বদলে যাব, মেয়েছেলে হয়ে যাব তা তো কোনদিন ভাবিনি। আমি এখন দেশ শাসন করব কি করে ?"

শৌনক প্রমুখ মুনিগণ বলল, "কিন্তু ওরা যে কেন মেয়েছেলে হয়ে গেল তা তো জানতে পারলাম না। সূত বলল :

আপনার ছেলে নয়। এর ঠিক্‌জী করার উদ্যোগ আপনি কিভাবে নিতে পারেন ?"

বৃহস্পতি চন্দ্রের দূতকে বলল, "এ আমারই ছেলে। এর কোথাও চন্দ্রের চিহ্ন নেই।" দূত চন্দ্রের কাছে গিয়ে শুনিয়ে দিল।

চন্দ্র বৃহস্পতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। দেবতা ও দানবের মধ্যে যে যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল তা আবার শুরু হল।

আবার এলেন ব্রহ্মা। বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন। যুদ্ধ করতে বারণ করলেন। তিনি তারাকেও

একবার সনকসনন্দ মুনিগণ শিবের দর্শন করার জন্য কুমারবনমে গিয়ে পার্বতীকে শিবের কাছে নগ্ন অবস্থায় দেখতে পেল। এতে পার্বতী ভীষণ লজ্জা পেলেন। তাঁর লজ্জা পাওয়া দেখে শিব ঐ বনে যে পুরুষ পা দেবে সেই যাতে নারী হয়ে যায় সেরকম ব্যবস্থা করে দিলেন। সুদ্যুম্ন এবং তার দলের সবাই যে নারীতে রূপান্তরিত হল এটাই ছিল তার কারণ। তারপর থেকে ইলা এই নামে পরিচিত হয়ে ঐ বনেই সে থেকে গেল। কিছুকাল কেটে গেল। চন্দ্রের ছেলে বুধের সঙ্গে এখানেই ইলার দেখাসাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনেই একে অন্যকে ভালবেসে ফেলল। এইভাবে ওদের দুজনের পারিবারিক জীবন যাপনের ফলে যে সন্তানের জন্ম হল সেই পুত্রসন্তানের নাম রাখা হল পুরূরব।

তারপর ইলা নিজের কুলগুরু বশিষ্ঠকে স্মরণ করল। নারী হিসাবে রূপান্তরিত সুদ্যুম্নের মনের অবস্থা বুঝে বশিষ্ঠ শিবের ধ্যানে বসল।

"আমাদের রাজা সুদ্যুম্ন যাতে আবার পুরুষ হন তার জন্য অনুগ্রহ করে বর দিন।" বশিষ্ঠ প্রার্থনা করলেন।
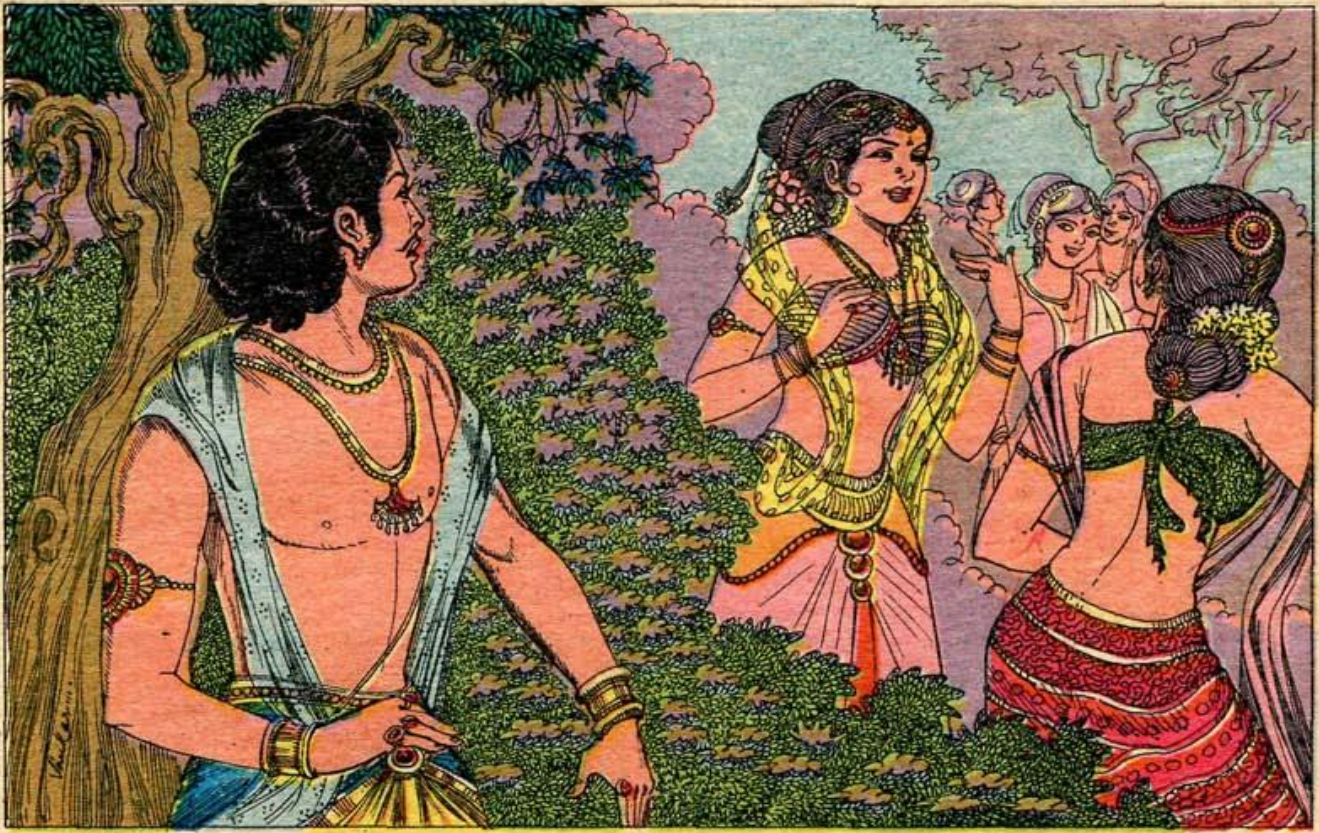
"আমার কথা খণ্ডন হতে পারে না। এখন খুব জোর একমাস পুরুষ এবং পরের মাস নারী হিসাবে যাতে সুদ্যুম্ন থাকে সেইরকম বর দিতে পারি।" শিব বললেন।

এইভাবে বশিষ্ঠের অনুগ্রহে পুরুষ হয়ে সুদ্যুম্ন ফিরে এল নিজের রাজধানীতে। দেশ শাসন করতে বাইরে বেরোত আর যে মাসে নারী হয়ে যেত সেই মাস কাটত অন্দর-মহলে। ছেলে বড় হওয়া পর্যন্ত এইভাবে কাটিয়ে পরে সুদ্যুম্ন ঐ অরণ্যে চলে গেল তপস্যা করার জন্য। সেখানেই নারদের কাছে নবাক্ষরী মন্ত্র শিখে ঐ মন্ত্র জপ করতে করতে দিন যাপন করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে সৌভাগ্যবশত মহাদেবী সিংহে আরোহণ করে সেখানে হাজির হলেন। সুদ্যুম্ন দেবীর অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় তাঁকে প্রণাম করল। পরে সে দেবীর অনুগ্রহ পেয়ে মুক্তি পেল।

সুদ্যুম্নের পরে পুরূরব দেশ শাসন করে প্রজাদের প্রশংসা পেল। পুরূরব খ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে উর্বশী মনে মনে তাকে ভালবাসল। তারপর উর্বশী ব্রহ্মার অভিশাপে মর্ত ভূমিতে নেমে গেল। এখানে পুরূরবের সঙ্গে তার যথেষ্ট মেলামেশা হল। একদিন উর্বশী পুরূরবকে বলল, "আমার দুটো ভেড়া আছে। ঐ ভেড়াগুলো আমার সন্তানের চেয়ে বেশী। তুমি ওদের দুজনকে রক্ষা করবে। আর একটি শর্ত হল তুমি কখনই আমার সামনে দিগম্বর হবে না। তৃতীয় শর্ত হল আমি যত ঘি খাব তত ঘি আমাকে দিতে হবে। এই তিনটের মধ্যে যে

কোন শর্ত ভঙ্গ করলে তোমাকে ছেড়ে চলে যাব।"

ওরা অত সুখে আছে দেখে দেবেন্দ্রের আর সহ্য হল না। ইন্দ্র একদিন স্বর্গে বসে গন্ধর্বদের বললেন, "স্বর্গে রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ যতই থাকুক না কেন উর্বশী না থাকলে স্বর্গ যেন স্বর্গ ই নয়। তাই ভাবছি ছলে বলে কৌশলে ঐ ভেড়াগুলোকে যদি অপহরণ করা যায় তাহলেই ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। যাও তোমরা এই কাজটি করে এস।"

গন্ধর্বগণ পুরূরবকে না জানিয়ে রাত্রের অন্ধকারে ভেড়াদের অপহরণ করল। ওরা চিৎকার করল। ভেড়াদের চিৎকার কানে যেতেই উর্বশী পুরূরবকে বলল, "আমি সন্তানের চেয়ে বেশী যে ভেড়াদের আদর করি তাদের কেউ হয়ত নিয়ে যাচ্ছে। তা না হলে ওরা এত আর্তনাদ করত না। তুমি ওদের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছ না?"

উর্বশীর কথা শুনে আর কালমাত্র বিলম্ব না করে বিবস্ত্র অবস্থায় চোরদের তাড়া করল পুরূরব। ঠিক সেইসময় গন্ধর্বগণ আলো ফেলল পুরূরবের গায়ে। ভেড়াদের নিয়ে ফেরার সময়
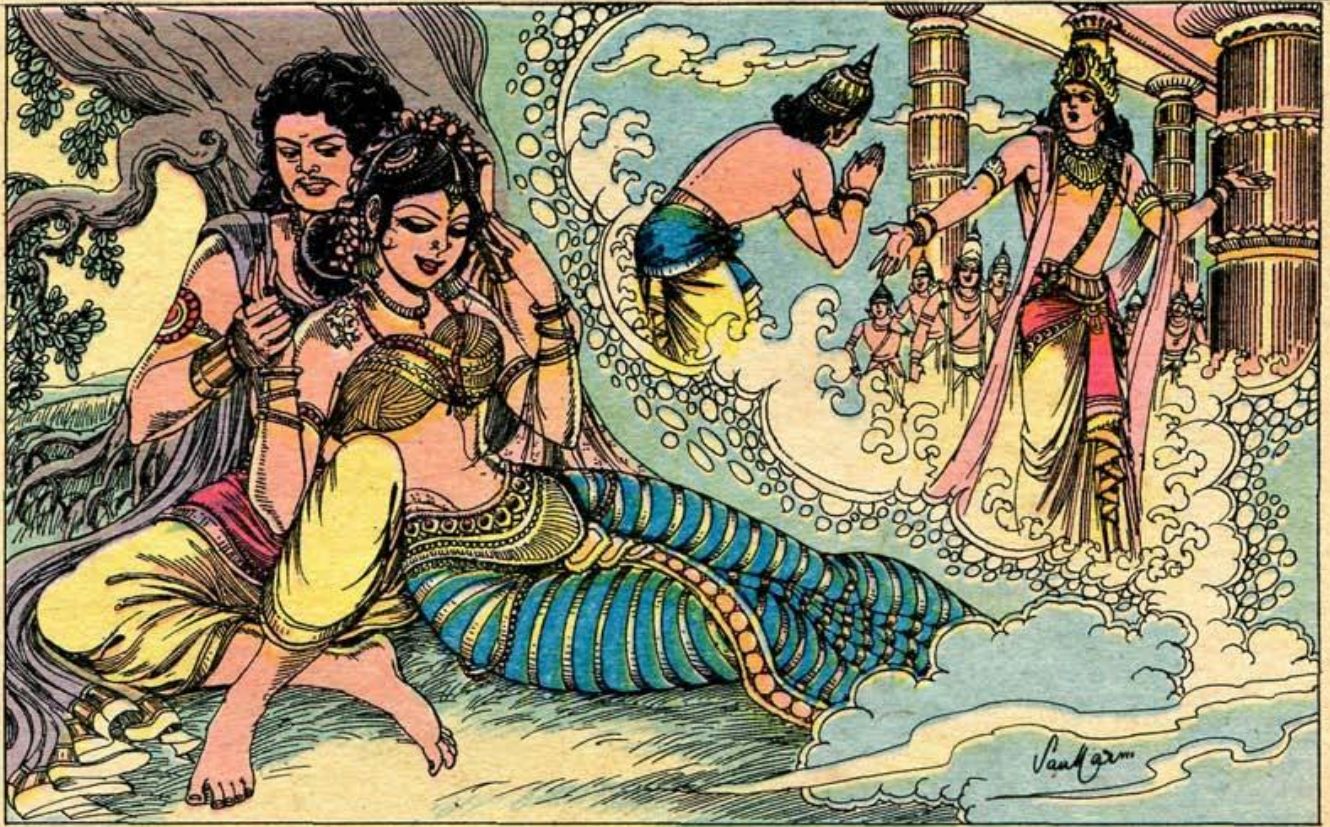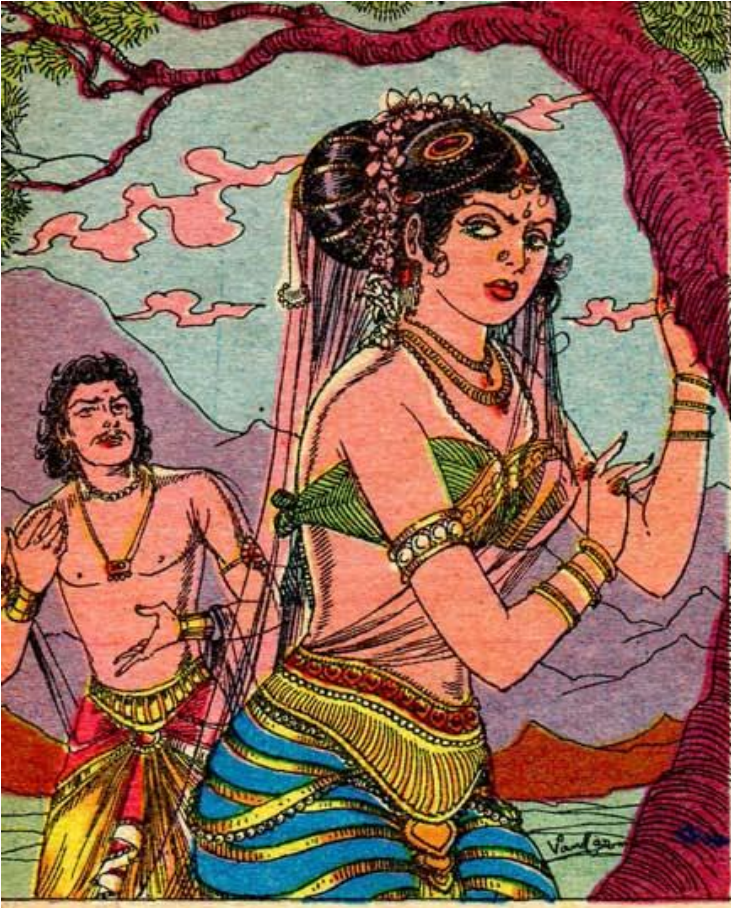
নগ্ন অবস্থায় দেখে পুরূরবকে ঊর্বশী বলল, "দেখ, তোমার সঙ্গে আমার যে কথা ছিল, যে শর্ত ছিল সেই শর্ত অনুসারে আর আমি তোমার সঙ্গে ঘর করতে পারব না। আমি ফিরে যাচ্ছি।"

ঊর্বশী স্বর্গে ফিরে যেতেই পুরূরবের মন ভেঙে গেল। তার আর জ্ঞানবুদ্ধি হল না। সে সব সময় ঊর্বশীর কথাই ভাবতে লাগল। তার সঙ্গে কিভাবে দিন কাটাচ্ছিল সেইসব কথাই সে দিনরাত ভাবত। হঠাৎ একদিন ঊর্বশী পুরূরবকে দেখা দিল।

তাকে দেখতে পেয়েই পুরূরব তার কাছে গিয়ে গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগল, "দেখ, আমি তোমার কোন ক্ষতি কোনদিন করিনি। আমাকে অত ভালবাসতে, রাতারাতি সব ভুলে চলে গেলে। এ কি ভাল করলে?"

ঊর্বশী বলল, "আমি নারী। আমার আবার প্রেম কি? আমার জন্য অত দুঃখ না করে মন দিয়ে দেশ শাসন করে যাও।"

পুরূরবের যে অবস্থা হয়েছিল সেই অবস্থাই হবে কিনা ঘৃতাচিকে দেখে ব্যাস অভিশাপ দেবে এই ভয়ে ঘৃতাচি মেয়ে পাখীতে রূপান্তরিত হয়ে উড়ে গেল। ব্যাস তীব্র বেদনা অনুভব করল। সেই মনোবেদনার ফলে ব্যাসের সঙ্গে অবনীর যে মিলন ঘটল তার ফলেই শুকের জন্ম হল।

পিতা পুত্রের কাহিনী

ব্যাস শুককে দেখে বলল, "এ তো অদ্ভুত ব্যাপার। নিশ্চয় এটা শিবের কারসাজি।" ব্যাস ছেলেকে গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে স্নান করাল। আকাশ থেকে দুন্দুভি বাজল। মাটিতে পুষ্পবৃষ্টি হল। নারদ প্রমুখগণ গান গাইলেন। রম্ভা ও অন্য অপ্সরীরা

নাচল। যেহেতু পাখির রূপ ধারণ-কারিণীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল সেইহেতু সন্তানের নাম হল শুক। শুক ক্রমশ বেড়ে উঠল। শুকের জন্য আকাশ থেকে হরিণের চামড়া, দণ্ড এবং কমণ্ডলু নিচে পড়ল। বড় হওয়ার পর শুকের উপনয়ন করিয়ে ব্যাস তাকে বৃহস্পতির কাছে বেদ পাঠ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। লেখাপড়ার পাঠ চুকে যাওয়ার পর গুরুদক্ষিণা দিয়ে শুক বাবার কাছে ফিরে এল।

শিক্ষিত হয়ে ফেরার ফলে আনন্দে শুককে জড়িয়ে ধরে ব্যাস খুব আনন্দ পেল। তারপর শুকের বিয়ের কথা ব্যাসের মনে ঢুকল। ব্যাস সুযোগ্য এক মুনিকন্যাকে খুঁজে এনে শুককে বলল, "বাবা, এখন তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে। বিয়ে করা, পুত্রের জনক হওয়া, সংসারের ধর্ম। তা না হলে মানুষের কীর্তি যুগ যুগ ধরে থাকে না। তাই বলছি, লেখপড়া শিখেছ এখন তুমি বিয়ে কর। আমি আশা করব তুমি কথা রাখবে। অনেক যুগ তপস্যা করে আমি তোমাকে পুত্রসন্তান হিসেবে পেয়েছি। আমার ভীষণ আশা তোমার মাধ্যমে আমার কীর্তি স্থায়ী হবে এবং আমার তখনই সদ্গতি হবে।"

এই কথা শুনে তার বাবাকে শুক বলল, "দেখ বাবা, আমাকে যেভাবে খুশী উপদেশ দাও আমি তা অবনত মস্তকে সানন্দে গ্রহণ করব কিন্তু বিয়ে করার উপদেশ দিয়ে আমাকে এভাবে সংসারে কেন ঠেলে দিতে চাইছ বাবা!"

মৎস্যকন্যা চাই

ইংরেজ আমলে এক অঞ্চলের রাজা ছিলেন বিচিত্র ধরনের মানুষ। যেমন ছিল তাঁর গোঁড়ামি তেমনি গোঁয়ার্তুমি।

একবার তিনি বঙ্গদেশে চাষাবাদের কায়দাকানুন দেখে গেলেন। তিনি যা দেখে গেলেন ঠিক সেই জিনিস দেশের কৃষকদের করতে বললেন। বাধ্য হয়ে কৃষকরা তাই চাষ করল। ফলে না হল চাষের ফসল তোলা না হল অন্য কিছু। দেশকাল ভেদে সব মাটিতে যে সব চাষ হয় না তা রাজাকে বোঝানোর ক্ষমতা কারুর ছিল না।

আর একবার রামপ্রতাপ ঠিক করল দেশে কাক রাখবে না। ঘোষণা করে দিল কাকগুলোকে মেরে ফেলতে। কাক মেরে যে আনল তাকেই পুরস্কার দেওয়া হল। গোটা দেশ থেকে কাক মেরে মেরে আনতে লাগল প্রজারা। রাজধানীতে হাজার হাজার কাকের মৃতদেহ এখানে ওখানে পড়ে থাকত। কাক পরোক্ষে দেশটাকে পরিচ্ছন্ন রাখত। কিন্তু হাজার হাজার কাককে মেরে ফেলার ফলে সারা দেশের আবহাওয়া দুর্গন্ধে ভরে গেল। তখন রাজা কাকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে পাশের দেশ থেকে জ্যান্ত কাক এনে দেবে তাকেই পুরস্কার দেওয়া হবে। এবাবদ রামপ্রতাপের অনেক টাকাপয়সা খরচ হল।

এ. সি. সরকার (যাদুসম্রাট)

একবার রামপ্রতাপ মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মহামন্ত্রী, মৎস্যকন্যা সম্পর্কে কিছু জানা আছে ?"

মন্ত্রী সবিনয়ে বলল, "মহারাজ জীবনে ঐ ধরনের প্রাণী আমি দেখিনি। তাই কিছু জানাতে পারছি না।"

"জীবনে আমিও দেখিনি, তবে কাল স্বপ্নে দেখিছি। ওপরের অংশ মানুষের নিচের অংশ মাছের। অদ্ভুত ব্যাপার তাই না ?" রাজা বললেন।

রামপ্রতাপের রাজভবনের সামনে বিরাট দীঘি ছিল। ঐ দীঘির জল সারা নগরের লোক খেত। দীঘিতে নৌকাবিহার করতেন। যে রাত্রে মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি মৎস্যকন্যার বিষয় আলোচনা করেছিলেন সেই রাত্রে কিছুক্ষণ নৌকাবিহার করে হঠাৎ রাজভবনে ফিরে গিয়ে মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

মন্ত্রী ছুটে এল। "আমি দীঘিতে দেখেছি মৎসকন্যা। আমার চোখের সামনে সেটা ডিঙির এপার থেকে ওপারে উঠে লাফ দিল। আমি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি। স্বচ্ছ জ্যোৎস্নার আলোতে, আমি দেখেছি,

ওপরের অংশটা ছিল মানুষের আর নিচের অংশটা মাছের। যে কোনভাবে ওটা আমি এখন চাই। পাছে সেটা চলে না যায় তার জন্য এই মুহূর্তে দীঘির চারদিকে পাহারা বসাতে হবে।"

"মহারাজ আপনি যা দেখেছেন সেটা ভ্রমও তো হতে পারে। একটা মস্তবড় মাছকে দেখে আপনি ঐ জ্যোৎস্নার আলোতে ভুল করে মৎস্যকন্যা ভাবতে পারেন।" মন্ত্রী সবিনয়ে বলল।

তার কথা শেষ হতে না হতেই অধৈর্য্য হয়ে রাজা বললেন, "মহামন্ত্রী, আমি তো আমার নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে পারিনা। যা করতে বলেছি তাই করুন। মৎস্যকন্যা ধরুন।"

জেলেরা এসে সারা দীঘি তোলপাড় করে হাজার হাজার মাছ ধরল কিন্তু মৎস্যকন্যা ধরা পড়ল না।

তখন রাজা বললেন, "দীঘির সমস্ত জল বের করে দাও।" রাজার এই নির্দেশের জবাবে মন্ত্রী বলল, "মহারাজ, সারা রাজধানীর লোক এই জল পান করে। লোকে জল পাবে কোথায় ?"

"আমি ওসব কোন কথা শুনতে চাই না। আমার মৎস্যকন্যা চাই।"
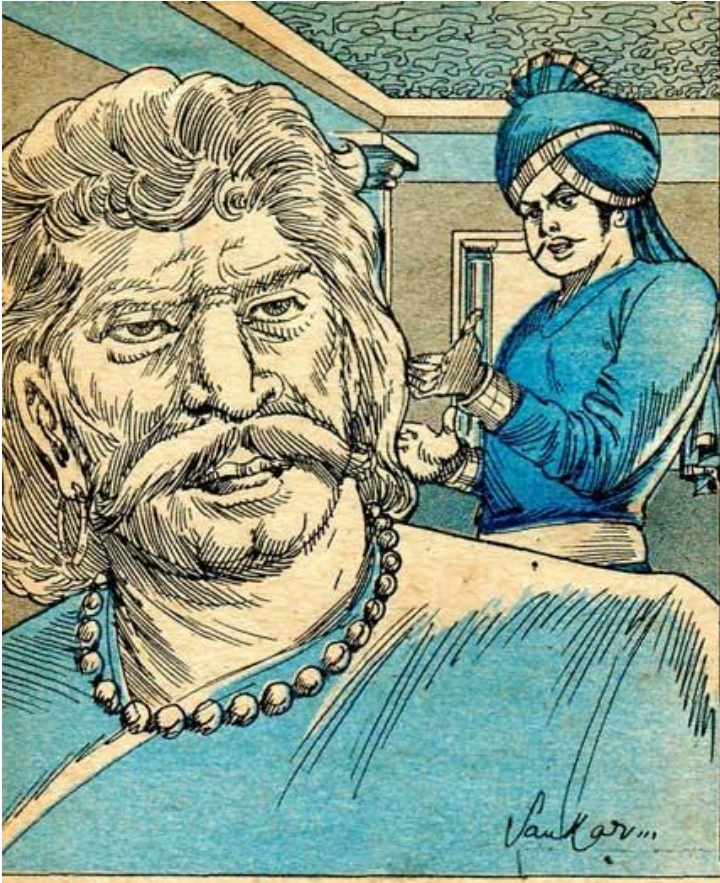
“ঠিক আছে মহারাজ। দীঘির সমস্ত জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। দীঘির সমস্ত জল বের করতে অন্তত তিনদিন সময় লাগবে। শেষবারের মত অনুরোধ করছি মহারাজ, আপনি অন্তত তিনদিন ভেবে দেখুন। তারপর আপনি যা বলবেন তাই করা হবে।” মন্ত্রী বলল।

রাজা ভীষণ বিরক্ত হলেন। মন্ত্রী ফিরে এল বাড়িতে। তার ভাইপো যাদুবিদ্যায় নিপুণ ছিল। তার নাম হলধর। সে বেড়াতে এসেছিল মন্ত্রীর বাড়িতে। মন্ত্রী-কাকাকে বিমর্ষ দেখে হলধর কারণ জানতে চেয়ে বিস্তারিত ঘটনা জেনে নিল। তারপর হলধর তার কাকাকে বলল, “কাকা, রাজার ভ্রম প্রমাণ করার মত যন্ত্র আমার কাছে আছে। আপনি বিশ্রাম করুন।”

মন্ত্রী বিশ্রামঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হলধর ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো একটা কাঁচের গ্লাসের নিচে লাগিয়ে দিল। একটা থালায় আধুলি রেখে গ্লাসটা রাখল। তারপর গ্লাসে কিছুটা জল রাখল। কাগজে আগুন ধরিয়ে দিল। ফলে কিছুটা ধোঁয়া হল। এমন সময় মন্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। ঐ আগুন, কিছুটা ধোঁয়া এবং জলের ভেতর দিয়ে মন্ত্রীকে গ্লাসের নিচে রাখা আধুলির দিকে তাকাতে বলল। মন্ত্রী ওটা দেখে বলল, “মনে হচ্ছে টাকা।”

“এক টাকাই আছে তো? একটাকার বেশি নেই তো? আপনি নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন?” হলধর জোর দিয়ে প্রশ্ন করল।

“না না আমি ঠিক দেখছি। এক টাকাই আছে।” মন্ত্রী বলল।

"দেখলেন ? আসলে কিন্তু টাকা রাখিনি, আধুলি, আধুলি রেখেছি। এই দেখুন।" বলে হলধর গ্লাসের তলায়, থালার উপরে জলের মধ্যে রাখা আধুলিটা তুলে দেখাল।

ভাইপোর কাছে শিখে নিয়ে মন্ত্রী একইভাবে রাজাকে আধুলিটা দেখাল। রাজা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "আমি পরিষ্কার একটাকা দেখতে পাচ্ছি। চোখকে অবিশ্বাস করতে পারি না।"

"ক্ষমা করবেন মহারাজ, চোখেরও ভ্রম হয়। আমার ভাইপো আমাকে এইভাবেই দেখিয়েছিল। আমিও জোর দিয়ে বলেছিলাম টাকা কিন্তু পরে দেখা গেল, না টাকা নয়, আধুলি। বিশ্বাস না হয় দেখুন কাঁচের পাত্রের তলায় কি আছে।" মন্ত্রী বলল।

রাজা তৎক্ষণাৎ কাঁচের পাত্র সরিয়ে থালায় দেখলেন আধুলি পড়ে রয়েছে।

রাজা বললেন, "তাহলে কি আমি শুধু মৎস্য দেখেছি ? মৎস্যকন্যা দেখিনি ?"

"কেন ভ্রম হবেনা মহারাজ। আপনি যে স্বপ্নে মৎস্যকন্যাকে দেখেছেন, জাগরণে সেই স্বপ্নের ছবি আপনার চোখের সামনে ভাসছিল। ফলে সেই স্বপ্নেরই ঘোরে আপনি মস্তবড় মাছকে দেখে মৎস্যকন্যা ভাবতে পারেন।" মন্ত্রী বলল।

মন্ত্রীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রাজা বললেন, "তাহলে তাই হবে।"

মন্ত্রীর বুদ্ধির ফলে প্রজারা সে যাত্রা বেঁচে গেল।

ফটো-নামকরণ প্রতিযোগিতা : পুরস্কার ২৫ টাকা

পুরস্কৃত নাম এপ্রিল '৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে·

* ফটো নামকরণ দুচারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই।
* ১০ শে ফেব্রুয়ারী '৭৯-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই। তার পরে পৌঁছানো চিঠি গ্রহণযোগ্য হবে না।
* জয়ী প্রতিযোগীকে ঐ দুটো নামের জন্য মোট ২৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।
* দুটো ফটোর নামকরণ শুধুমাত্র পোস্টকার্ডেই লিখে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই কার্ডে অন্য কোন বিষয় লেখা চলবে না।

CHANDAMAMA PHOTO CAPTION COMPETETION (BENGALI),
POST BOX NO. 9116. CALCUTTA-700 016.

ডিসেম্বর '৭৮ ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতার ফল

প্রথম ফটোর নাম : কথা কলি

দ্বিতীয় ফটোর নাম : কথা বলি

পুরস্কার পেয়েছেন : জবা চক্রবর্তী, রউরকেলা-১৩, ওড়িশা

পুরস্কারের ২৫ টাকা এই মাসের মধ্যেই পাঠানো হবে

Printed by B. V. REDDI at Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for CHANDAMAMA CHILDREN'S TRUST FUND (Prop. of Chandamama Publications) 2 & 3, Arcot Road, Madras-600 026 (India). Controlling Editor : NAGI REDDI.

చందమామ අම්බිලි මාමා

Chandamama, now published in twelve Indian languages including English and entertaining millions of readers in India, makes its debut in Srilanka. To the President and people of Srilanka, we dedicate our inaugural issue in Sinhala.

AMBILIMAMA

CHANDAMAMA

the monthly magazine for children through which the old become young and the young remain young.

চাঁদমামা CHANDAMAMA चांदोबा

চাঁদমামা ক্যামেল কালার কনটেস্ট

কোনও প্রবেশমূল্য নেই

পুরস্কার জিতে নাও।

ক্যামেল—প্রথম পুরস্কার ১৬ টাকা
ক্যামেল—দ্বিতীয় পুরস্কার ১০ টাকা
ক্যামেল—তৃতীয় পুরস্কার ৬ টাকা
ক্যামেল—৬টি সান্ত্বনা পুরস্কার
ক্যামেল—১০টি সার্টিফিকেট

বিন্দু-চিহ্নিত লাইন বরাবর কেটে নাও
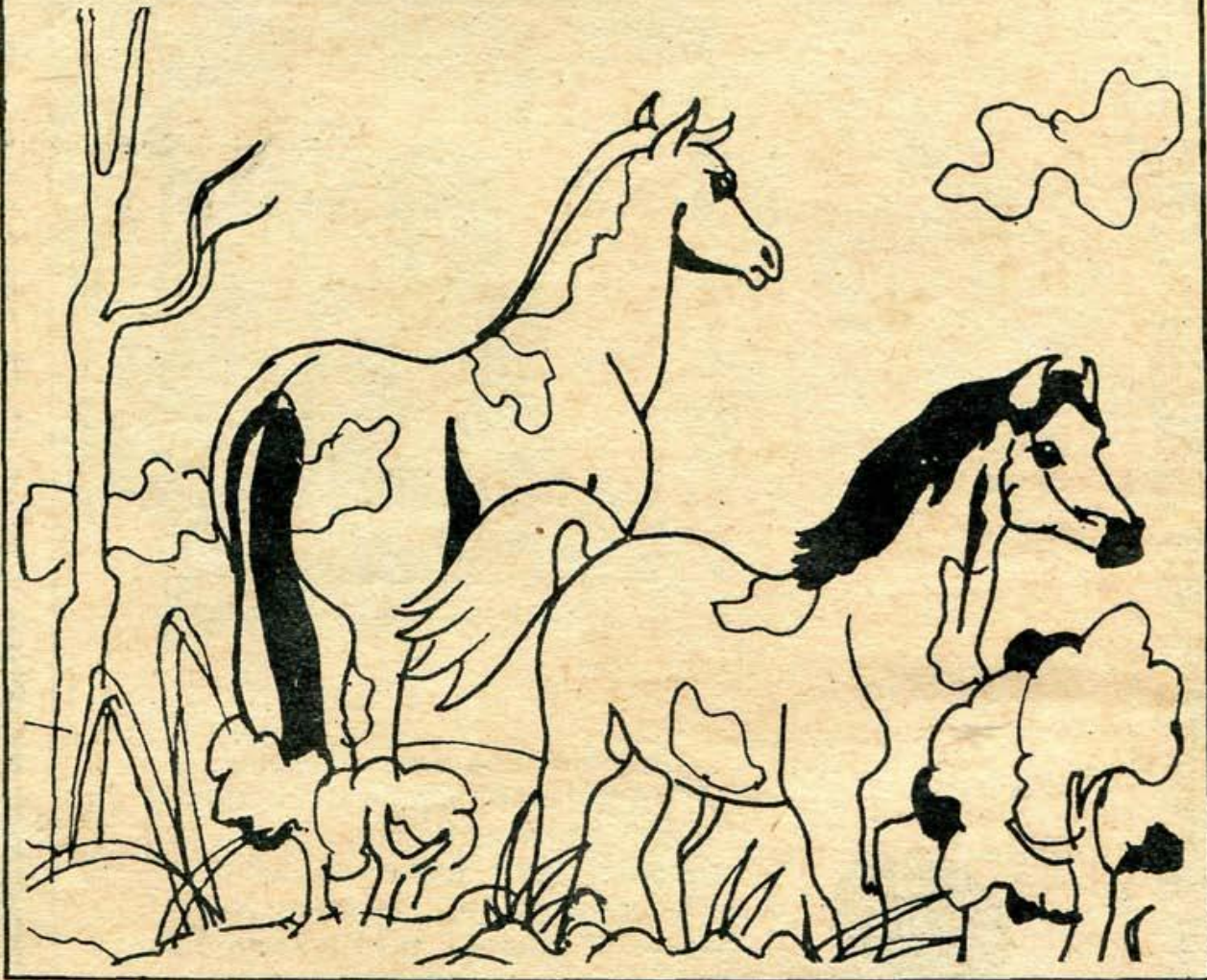
১২ বছর বয়স পর্যন্ত যে কোনো ছাত্র যোগ দিতে পারে। উপরোক্ত ছবিটি যে কোনো ক্যামেল রং দিয়ে রঙ্গীন চিত্রে পরিণত কর। আর, ঐ রঙ্গীন চিত্রটি প্রবেশপত্র হিসাবে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও P.B. No. 9928, COLABA, Bombay-400 005. ফলাফল চূড়ান্ত বিবেচিত হবে এবং ঐ ব্যাপারে কোন চিঠিপত্রের আদান প্রদান গ্রাহ্য হবে না।

Name -- Age ----------

Address --

ইংরাজীতে নাম ও ঠিকানা লেখো।

খেয়াল রাখুন, গোটা ছবিটিই যে রং করা হয়। 31-3-1979 প্রবেশপত্রিকাটি এই তারিখের আগে পাঠান।

CONTEST NO.7

৫ বছরের মেয়ে রীণা বসু জন্মদিনের

বলা বাহুল্য, যে, ব্যাঙ্কের নানাবিধ কার্যকলাপ রীণার মত ছোট মেয়ের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু সে তার এক বন্ধুর কাছে এই "কিডি ব্যাঙ্ক" পুতুলটি দেখেছিল আর লক্ষ্য করেছিল তাকে এই পুতুলের ভিতর পয়সা ফেলতে। তখনই রীণা ঠিক করে ছিল যে তারও ঐ রকম একটি ব্যাঙ্ক চাই যাতে সে নিজের জন্য অল্প কিছু পয়সা জমাতে পারে। লাখ শিশুদের মধ্যে রীণা মাত্র একজন, যাদের প্রত্যেকের কাছে অন্ধ ব্যাঙ্কের "কিডি ব্যাঙ্ক" পয়সা জমানো একটি মজার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রায় ৫৫ বছরের ব্যাঙ্ক-চালানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং সারা দেশে ৬০০ অপেক্ষা অধিক শাখা সমেত অন্ধ ব্যাঙ্ক আরও বহু প্রকল্পের প্রবর্তন করেছে। যেমন – কল্পতরুভূ, ভাগ্য লক্ষ্মী, সমরক্ষা, সমক্ষেমা, জনসহায়, কর্ষকসহায়, গৃহকল্প এবং নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প। তাছাড়াও, শিল্পোদ্যোগেও অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে যার অধীনে অসমর্থ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। গভীর চিন্তা-প্রসূত প্রতি প্রকল্পেই আপনার চাহিদা মেটাবার একান্ত উপযোগী।

বোস মহাশয় তাঁর ছোট্ট মেয়ের হাতে তুলে দেবার মত ব্যাঙ্ক খুঁজে পেলেন— অন্ধ্রা ব্যাঙ্কের কিডি ব্যাঙ্ক!

দি অন্ধ্র ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ ও সেন্টাল অফিস ঃ
সুলতান বাজার, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০১

অন্ধ্র ব্যাঙ্ক—
জন সাধারণের চাহিদার প্রতি সমবেদনশীল।

চেয়ারম্যান—ও স্বামীনাথ রেড্ডী।

KIRON/AB/78 BL